প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়
৩৮/এ পিয়ারীমোহন রায় রোড
কলকাতা-৭০০০২৭

মুদ্রক ঃ আলপনা আর্ট কটেজ
৮/সি, দমদম রোড
কলকাতা-৩০

উৎসর্গ

মৃত্যুর নীল বিষণ্ণতা ঘিরে আছে যাঁর স্মৃতি—

সেই সদ্যপ্রয়াতা মা'কে

আমার কথা

নামকরণ থেকেই বোঝা যাবে, চিত্রকলা সম্পর্কিত গবেষণামূলক আলোচনা এই বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। আবার নাম দেখে যা মনে হতে পারে, ছবি নিয়ে নিছক ছেলেভুলোনো গল্পকথা বা কল্পকাহিনীও এখানে বলা হয়নি। চিত্র-শিল্পের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের অল্পই সাধারণ পাঠকের জানা। সেই বর্ণাঢ্য ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে সেই অনুযায়ী কালজয়ী শিল্পীদের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দুরূহ তাত্ত্বিক ভাষায় নয়, সহজবোধ্য কাহিনীর ভঙ্গীতে। বিষয়ভিত্তিক এই তুলনামূলক তথ্যের সমাহার বাংলা বইয়ের জগতে এক অভিনবত্বের স্বাদ আনবে, এই আশা করা অন্যায় নয়।

বলা বাহুল্য, শিল্পীদেরও সেইমত নির্বাচন করে নিতে হয়েছে। এই ধরনের লেখায় এটা জরুরী। এবং এই বেছে নেওয়ার মাপকাঠি একটাই— প্রবন্ধের বক্তব্য ও দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ শিল্পী সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে কোনো একটি বিষয়ের আলোচনায় সম্ভাব্য শিল্পী তালিকা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ (exhaustive) নয়।

বিশেষজ্ঞ নন, বাংলা বইয়ের উৎসাহী সাধারণ পাঠকই এই বইয়ের লক্ষ্য। তাঁরা যদি আনন্দ পান, চিত্রকলা সম্পর্কে আরো জানার ইচ্ছা যদি তাঁদের মধ্যে জাগে, তবেই আমার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে। ভুলভ্রান্তিগুলি মাফ করে নেবেন।

বিশেষভাবে দু'জনের অকৃত্রিম উৎসাহ এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ সাহায্য বইটি প্রকাশের পেছনে রয়েছে। এরা হলো বন্ধুবর কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। এরা না হলে এসব বইটই করা যায় না, তাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

কলকাতা
আগস্ট, ১৯৬০

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছাপা হয়েছে	হবে
৪, ৮	আত্মোপলদ্ধি	আত্মোপলব্ধি
৭	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
২, ১৫, ৩৫	উপলদ্ধি	উপলব্ধি
১৪, ১৮	কাঙ্খিত	কাঙ্ক্ষিত
১৫, ১৮, ১৯	নিরবিচ্ছিন্ন	নিরবচ্ছিন্ন
২০	অগ্নুৎপাত	অগ্ন্যুৎপাত
২০, ২১, ২৩	স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
২৫	স্বত:স্ফূর্ত	ঐ
২৬	ক্লডিয়াস সিভিলিসের	জুলিয়াস সিভিলিসের
৩৬	সন্মান	সম্মান

চিত্রগুরু ও তাঁর বিখ্যাত শিষ্যরা

আর পাঁচটা শিল্পের মত চিত্রশিল্পেও গুরুশিষ্য সম্পর্কের ঐতিহ্য বেশ পুরনো। বিশেষ করে রেনেসাঁসের সময় থেকেই চিত্রশিল্পে নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ প্রয়োগের যে জোয়ার এসেছিল তার টানে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী জীবিকা, সম্মান ও প্রতিপত্তির মাধ্যম হিশেবে ছবি আঁকার জীবন বেছে নিয়েছিলেন। জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি উন্মেষের ওই স্বর্ণযুগে জনসাধারণের মধ্যেও চিত্রশিল্পের প্রতি ব্যাপক অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। ফলে ভাল ছবির কদর ও বিক্রি বেড়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়মেই ইউরোপে, বিশেষ করে রেনেসাঁসের পীঠস্থান ইতালির নানা শহরে, গড়ে উঠেছিল ছোটবড় অসংখ্য স্টুডিও যেখানে ছাত্ররা গুরুর তত্ত্বাবধানে চিত্রসাধনার গোড়ার পাঠগ্রহণ করতেন। ছবির প্রচুর ফরমায়েশ থাকায় শিল্পগুরুর পক্ষে একহাতে ছবি শেষ করা সম্ভব ছিল না। সে যুগের অনেক ছবিই তাই গুরুশিষ্যের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। ছবির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তিনি নিজহাতে সম্পন্ন করে চলে যেতেন চিত্রান্তরে, বাকি কাজ তাঁর নির্দেশমত ছাত্ররা শেষ করতেন। তাছাড়া স্বাধীনভাবেও ছাত্ররা অনেক কাজ করার অনুমতি পেতেন। তাতে একদিকে যেমন শিক্ষানবিশিতে হাত পাকতো, ভবিষ্যত শিল্পীপ্রতিভা উন্মেষের গোড়া-পত্তনও হত।

তবে প্রতিভাধর শক্তিশালী শিল্পীরা একই গুরুর ছত্রছায়ায় খুব বেশিদিন থাকেন নি। যাঁর কাছে যতটুকু শেখার তা সম্পন্ন করে চলে গিয়েছেন আরো সুখ্যাত কোনো চিত্রশিক্ষকের স্টুডিওতে যাতে অধিগত শিক্ষার ভিত্তি আরো ব্যাপক হয়, মৌলিক শিল্পব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। কোথাও কোনো বিখ্যাত শিল্পী নতুন কিছু শেখাচ্ছেন, একথা শোনামাত্র তাঁরা হাজির হতেন তাঁর কাছে। এজন্য নিজের ঘর, বাসস্থান ছেড়ে দূর শহরে পাড়ি দিতেও পিছপা

হতেন না, এমনই ছিল তাঁদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা। এইভাবে স্তরে স্তরে কঠিন সাধনা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতেন কালজয়ী সব শিল্পীরা। চিত্রের প্রকরণ ও পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও গভীরতায় তাঁরা গুরুর সমান মর্যাদা লাভ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গিয়েছেন গুরুকে। তাতে গুরু ও চিত্রশিল্পের গৌরব বেড়েছে। আর চিত্ররসিকরা পেয়েছেন বারবার ফিরে পড়ার মত চিরন্তন সব কাহিনী।

এইভাবেই আবিস্কৃত হয়েছিল মহাশিল্পী **লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির** অনন্য প্রতিভা। সেটা ছিল ১৪৭৫ সাল। মাত্র তেইশ বছরের যুবক লিওনার্দো ফ্লোরেন্সের চিত্রকর ও ভাস্কর **ভেরোচ্চিও-র** ছাত্র হিশেবে তাঁর স্টুডিওতে কর্মরত। ওই বছর ভেরোচ্চিও বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে Baptism of the Christ তৈলচিত্রটি আঁকা শুরু করলেন। ছবির মধ্যমণি যীশু, তাঁকে দীক্ষা দিচ্ছেন সেণ্ট জন। বাঁ পাশে দু'জন পরী, হাঁটু পেতে বসে। ছবির মূল অংশ ভেরোচ্চিও করলেও বাঁপ্রান্তের পরীকে চিত্রিত করার ভার পড়ল লিওনার্দোর ওপর। তরুণ লিওনার্দো মূর্তিটিকে এমন দক্ষতায় ফুটিয়ে তুললেন যে গুরুর করা ছবির অন্যান্য অংশ মনে হল সাদামাটা, প্রথাগত। বাস্তবিকই, মূর্তিটির সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী, মাথার জটিল নক্‌শা, মস্তকাভরণ আঁকার কল্পনাশক্তি এবং শান্ত সমাহিত অভিব্যক্তির বিচারে লিওনার্দোর কাজ অনেক উঁচুস্তরের। ভেরোচ্চিও-র পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল শিক্ষানবিশ ছাত্রের একটি খুচরো কাজে। বুঝলেন, এত বছরের একনিষ্ঠ সাধনা ও অধ্যবসায়েও পৌছতে পারেননি শিল্পসৃষ্টির সেই স্তরে যেখানে শিল্পী ও তাঁর শিল্প অমরত্ব লাভ করে। ক্ষোভে, লজ্জায়, নিজের অক্ষমতার এই উপলব্ধি নিয়ে ভেরোচ্চিও জীবনের মত ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন, মনোনিবেশ করলেন ভাস্কর্যে। আর কখনো রঙ তুলি স্পর্শ করেননি। তদানীন্তন শিল্পী ও শিল্পসমালোচক ভাসারি লিওনার্দোর জীবনকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন ঘটনাটির। আনকোরা এক শিক্ষার্থীর কাছে গুরুর পরাজয় স্বীকারের এমন দৃষ্টান্ত চিত্রশিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সম্ভবত আর নেই। ওই ছবি থেকেই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ পর্বের সূচনা, যাকে ভাসারি বলেছেন হাই রেনেসাঁস।

রেনেসাঁসের আর এক মহারথী **রাফায়েল** পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর জন্মস্থান উরবিনো ছেড়ে ছুটে এলেন ইতালির পেরুজিয়া শহরে। মনে শিল্পী হবার স্পৃহা। সেখানে **পিয়েত্রো পেরুজিনো**-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পেরুজিনো তখন উম্‌ব্রিয়া অঙ্কনরীতির প্রাণপুরুষ, প্রভূত খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী। জহুরী চিনলেন জহর। অল্পদিনেই গুরুর চিত্রশৈলী তরুণ রাফায়েল নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে ফেললেন। ভাসারির ভাষায়, গুরু শিষ্যের ছবি পাশাপাশি রাখলে বোঝা যেত না কোন ছবি কার আঁকা। একটানা কয়েকটা বছর পেরুজিনোর কাছে শিখে নিলেন যা ছিল জানার। ১৫০৪ সালে স্বাধীনভাবে করা পৃথিবী বিখ্যাত The Marriage of the Virgin ছবিতে দেখা গেল, রেখার সাবলীল সৌন্দর্য প্রকাশের কৌশলে গুরুর সমান দক্ষতা অর্জন করেছেন। কিন্তু কোনো মহান শিল্পী শুধু নকলনবিশির বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেন না। রাফায়েলেরও সে ভবিতব্য নয়। ফ্লোরেন্সে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর মধ্যে কাউন্সিল হল চিত্রিত করা নিয়ে রেষারেষি ও প্রতিযোগিতার কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল বহুদূর। দুর্নিবার সেই আকর্ষণে রাফায়েল সহসা সবকিছু ছেড়ে হাজির হলেন তাঁর বহু-বাঞ্ছিত ফ্লোরেন্সে। সেখানেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। ফ্লোরেন্সে আঁকা ম্যাডোনার ছবিগুলিতে পেরুজিয়ার রীতিপদ্ধতির প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব পথ খুঁজে পেলেন। তখন থেকেই তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর, তাঁর জয়যাত্রার শুরু।

ষোড়শ শতকের ফ্লেমীয় চিত্রশিল্পী **পিটার পল রুবেন্স**-এর মত ছাত্র-সংখ্যা অতীতের আর কোনো বড় শিল্পীর ছিল কিনা সন্দেহ। তাদের মধ্যে কালের বিচারে অমর হয়ে রয়েছেন **অ্যান্টনি ভ্যান ডাইক**। আর পাঁচজনের মতই ইউরোপজোড়া খ্যাতির অধিকারী অভিজাত রুবেন্সের সাহচর্যে হাত পাকাবার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে যা হয়, তিনিও গুরুর চিত্রভঙ্গীটি পুরো নকল করে নিলেন। কিন্তু সেখানেই না থেমে তাঁকে টেক্কা দিতে চাইলেন। রুবেন্সের থেকেও ভ্যান ডাইকের ছবির রঙ হয়ে উঠল আরো উজ্জ্বল, লোকজন আরো উচ্ছল। কিন্তু অনুকরণ অনুকরণই, তার বেশি কিছু নয়। রুবেন্সের সহজ স্বাভাবিকতা ছবিতে এলো না, ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে

উঠল। এই ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি ভ্যান ডাইকের। বুঝলেন, রুবেন্সের সঙ্গে নিজের মেজাজের মিল নেই। সুতরাং মৌলিক রীতিপদ্ধতি খুঁজে নেওয়া ভাল। এই আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতিতে নিজের শান্ত ভাবুক চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাঢ় কালো ও সোনালী চকলেট রঙের জাদু ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল ভ্যান ডাইকের ক্যানভাসে। চরিত্রের সূক্ষ্মতম আবেগ আর অনুভূতি তিনি ফুটিয়ে তুললেন অনন্যসাধারণ দক্ষতায়। ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্লস স্টুয়ার্ট সমেত ইউরোপের বিভিন্ন সেনাপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তির ছবি তিনি এঁকেছিলেন। সেসব কাজে রুবেন্সের উদ্দামতার বদলে এসেছে অনবদ্য সংযম, সেই সঙ্গে আছে মহান শিল্পীসুলভ সংবেদনশীলতার ছাপ। ভ্যান ডাইকের পরিণত শিল্পকর্ম রুবেন্সের বিপরীত কোটির, কিন্তু স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং সে কারণেই স্মরণীয়।

বেশি ছবি আঁকেননি ভেনিসের শিল্পী জর্জনে, কিন্তু কাব্যিক সুষমায়, রঙের সুনিপুন ব্যবহারে, আবহসৃষ্টির অসামান্য দক্ষতায় রেনেসাঁসের স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিশেবে তাঁর স্থান পাকা হয়ে আছে। রেনেসাঁসের শেষ মহাশিল্পী টিশিয়ানকে পেয়েছিলেন একাধারে ছাত্র ও সহকারীরূপে। ছোট-বেলাতেই টিশিয়ানের চিত্রশিল্পী হবার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে তাঁর কাকা ভেনিসের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী ও চিত্রগুরু জিওভান্নি বেল্লিনির কাছে চিত্রশিক্ষার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেন। সেখানে টিশিয়ান কঠোর পরিশ্রমে নিজের প্রতিভা বিকাশে মগ্ন রইলেন। দীর্ঘদিন গুরুর চিত্ররীতি অবলম্বনে ছবিও এঁকে চললেন। কিন্তু তারপর জর্জনের নতুন ধরণের কাজের প্রকরণ ও স্টাইল দেখে তাতে আকৃষ্ট হন এবং একত্রে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। তখন টিশি-য়ানের বয়স সবে আঠারো। জর্জনের মত এত নিখুঁত ছবি আঁকতে শুরু করলেন যে লোকে তা জর্জনের বলে ভুল করত।

এই সাদৃশ্য অচিরেই বিপত্তি ঘটাল। ভাসারি শুনিয়েছেন সে কথা। ১৫০৭ সাল নাগাদ শহরে একটি অট্টালিকার বাইরের দেওয়ালের একাংশ চিত্রিত করার ফরমায়েশ পেলেন টিশিয়ান। অন্য অংশটি জর্জনে আগেই শেষ করেছিলেন। কাজের যেটুকু টিশিয়ান করেছিলেন তার খানিকটার

আবরণ উন্মোচন করে দেওয়া হল। গণ্যমান্য ও পরিচিত ব্যক্তিরা জানতেন না ওটুকু তাঁর করা। তাই জর্জনের সঙ্গে দেখা হতেই অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, এটা তিনি আগে যা করেছেন, তার থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। শুনে জর্জনে চটে লাল। যতদিন টিশিয়ানের কাজ সম্পূর্ণ না হল, ততদিন বাইরে পারতপক্ষে বেরোলেন না। তারপর থেকেই তাঁকে আর একসঙ্গে কাজ করতে দিতেন না।

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ওই সময় টিশিয়ানের প্রতিভা বিকাশে জর্জনের অবদান। বোঝা যায়, কেন বহু ছবি কার করা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। অবশ্য এই মতভেদের আর একটা কারণ, টিশিয়ান গুরুর অনেক কাজ সহকারী ছাত্র হিশেবে সমাপ্ত করেছেন। তবে এসবই টিশিয়ানের শিল্পী-জীবনের গোড়ার দিকের কথা। পরবর্তীকালে গুরুকে অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের সৃষ্টিকে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে জর্জনের অকাল মৃত্যুতে ভেনিসের চিত্রজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী ষাট বছর ধরে তা পূরণ করে রেখেছিল এই মহীরুহসদৃশ প্রতিভা।

আমাদের দেশে গুরুশিষ্য সম্পর্কের সার্থকতম উদাহরণ সম্ভবত অবনীন্দ্র-নাথ ও নন্দলালের। অবনীন্দ্রনাথের কাছেই নন্দলালের চিত্ররচনায় হাতে-খড়ি। সব ছেড়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন শিল্পী হবার বাসনায়। তারপর গুরুর অসীম প্রভাবে ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় ভারতীয় কাব্য, পুরাণ, উপাখ্যান, ইতিহাস এইসব নিয়ে ছবি এঁকে গেছেন। কিন্তু গুরুর মোগল পার্শিয়ান চিত্ররীতি ও কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক মেজাজ গ্রহণ করেননি। এখানে তিনি স্বভাবত স্বতন্ত্র। অজন্তা ভ্রমণের পর (১৯০৯) অবনীন্দ্রনাথের বদলে অজন্তার প্রভাব দেখা দিল ছবিতে। বর্ণ নয়, রেখাপ্রধান হয়ে উঠল তাঁর ছবি। তবে নন্দলালের শিল্পীসত্তার প্রকৃত মুক্তি ঘটে ১৯২০ সালে শান্তি-নিকেতনে জগত, জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর। এরপর তিনি বারবার নিজেকে অতিক্রম করে পাড়ি দিয়েছেন চিত্রসৃষ্টির নতুন নতুন পথে। এই পরিণত, আধুনিকতম নন্দলালই সত্যিকার পরিচয়ে ভাস্বর।

শিল্পশিক্ষকের ভূমিকায় তিনি পরবর্তীকালের কৃতি শিল্পীদের তৈরী করেছেন। কিন্তু তাঁদের কখনো নিজের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চাননি। শুধু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র ভারতের অন্যতম সেরা ভাস্কর ও চিত্রকর রামকিংকরের স্মৃতিচারণায় ধরা আছে চিত্রগুরুর এই অন্তরঙ্গ ছবি —"শিক্ষক হিসাবে তিনি স্বাধীন চিন্তায় কখনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। যেটা যার অভিরুচি, সেটার উৎসাহই দিতেন। এবং সেইভাবে নিজেকে ভাবিয়ে তার গলদ, কোথায় স্বাদের অভাব ঘটছে সেটাই বোঝাতেন। তর্কবিতর্ক অনেক হত। আবার পরমুহূর্তে বন্ধুর মত ব্যবহার থাকত।" (দেশ, নন্দলাল বসু সংখ্যা)। চিত্রকর **বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ও** নন্দলালের অন্যতম শিষ্য ছিলেন, কিন্তু গুরুর প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব সৃজন প্রতিভায় বিষয় ও রীতি বেছে নিয়ে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। রামকিংকর সম্বন্ধেও একই কথা। ছাত্র ও শিষ্যের সার্থকতার এই উত্তরণেই শিল্পগুরু ও তাঁর শিক্ষার গৌরব।

চিত্রসৃষ্টি যেখানে আত্মজীবনী

শিল্পীর আত্মমগ্ন তুলি চালনায় শাদা ক্যানভাস নানা রঙের ছটায় যখন ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, একটা চিত্ররূপ দ্রুত অবয়ব নিতে থাকে, ক্যানভাসে এসে পড়ে নিজের জীবনের সেইসব ঘটনা ও স্মৃতির ছায়া যা তাঁর অনুভূতিতে, চেতনার গভীরে মিশে গেছে। অবচেতন মনে বহুদিনের সযত্ন লালিত সব অভিজ্ঞতা ভীড় জমায় তুলির মুখে। শুধু ফেলে আসা সময়ের নয়, বর্তমান জীবনের নানা দুঃখবোধ আর আনন্দানুভূতিও তাঁর শিল্পীবোধকে উদ্বুদ্ধ করে, সঞ্চিত হয় সৃষ্টির মহামূল্য রসদ। সংবেদনশীল শিল্পী তাই শিল্পকর্মে খুঁজে পেতে চান নিজের অস্তিত্বকে। অন্যত্র যা প্রকাশ করার সুযোগ মেলেনি, জীবনবোধ-সঞ্জাত সেই অব্যক্ত আবেগ মুক্তি পায় রঙের অতলস্পর্শীতায়, অবয়বের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়। সেইসব ছবিতে মূর্ত হয়ে থাকে শিল্পীর জীবন ও সময়ের নানা অংশের জীবন্ত উদ্ঘাটন। ছবি হয়ে ওঠে তাঁর আত্মজীবনীরই একাংশ। কখনো এই আত্মপ্রকাশ প্রচ্ছন্ন, ইঙ্গিতময়। কখনো তা সরাসরি উপস্থাপনায় সরব। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এইভাবেই গড়ে উঠেছে স্বল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত যেখানে চিত্রসৃষ্টি আর আত্মজীবনী সমার্থক।

মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোতে আত্মজীবনের নানা দিকের উল্লেখ পরোক্ষ, গভীর ব্যঞ্জনাময়। তাঁর ছবি আর ভাস্কর্য দেখলে মনে হয় নিজের কথা নয়, সাধারণভাবে সর্বজনীন সত্যই তাতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেইসব সত্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে। তারপর সেগুলো একে একে প্রকাশ করেছেন নানা ধর্মীয় চিত্রে, ভাস্কর্যে। জাগতিক যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্খা ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাসের গভীরে। Resurrection of Christ শীর্ষক তিনটি অসামান্য রেখাচিত্রে ঘটে গেছে তার মর্মস্পর্শী প্রকাশ। নিজের ধর্মীয় ভাবাবেগ আর আধ্যাত্মিক আবিষ্টতার পরিচয়

তিনি পৃথিবীবিখ্যাত সিষ্টিন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা বিভিন্ন প্রফেট বা ভবিষ্যত বক্তাদের ছবিতে রেখে গিয়েছেন। যে অসীম অদম্য সৃষ্টিশক্তি তাঁর সারা জীবনের কর্মপ্রেরণার উৎস, ওই চ্যাপেলে আদমের সৃষ্টিকর্তা God the Father-এর অবিস্মরণীয় চিত্রায়নে সেই শক্তিকে চিনে নেওয়া যায়। জগত ও জাগতিক জীবনের সৃষ্টির প্রতীক তিনিই। আর Crucification of St. Peter ছবিতে শিল্পী নিজের বেদনাবোধ দিয়ে পিটারের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। এ তাঁর মানবজীবনের দুঃখদুর্দশার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ধর্মবিশ্বাসী মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর এইসব কাজে এক আধ্যাত্মিক আত্মচিত্র যেন ফুটে ওঠে।

শিল্পীদের জীবনকে পড়ে নেওয়ার এক নির্ভরযোগ্য দলিল তাঁদের আত্মপ্রতিকৃতি। এখানে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুশী করার বাধ্যবাধকতা নেই। তাই সহজেই স্বমুখকে করে তুলতে পারেন যাবতীয় আবেগ, জ্বালা ও দহন প্রকাশের মাধ্যম। রেমব্রান্ট ছাড়া কে-ই বা একাজে সার্থকতর? জীবনের বিভিন্ন সময় আঁকা ষাটটিরও বেশি স্বচিত্রে ধরা আছে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের জ্বলজ্বলে স্বাক্ষর। তাতে জানা যায়, যৌবনের রূপরসমোহজাত বেপরোয়া আনন্দানুভূতি ও আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে যার শুরু, বাস্তবতার কঠিন অভিজ্ঞতায় পুড়ে পুড়ে সেই শিল্পীজীবন ক্রমশই এগিয়ে চলেছে বৃহত্তর আত্মোপলব্ধির দিকে। একদিকে জীবনের আনন্দ, অন্যদিকে দুঃখের দহন—শিল্পের মালমশলা এই দিয়েই তৈরী। এই দুই-এ মিলে রেমব্রান্টের জীবন ও সৃষ্টি হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ।

স্ত্রী সাসকিয়ার সঙ্গে বিখ্যাত আত্মচিত্রে মূর্ত হয়ে আছে শিল্পীর ভাবনাচিন্তাহীন বিবাহোত্তর জীবনের উচ্ছলতা ও সুখানুভূতি। সেখানে পানপাত্র হাতে তুলে ধরে রেমব্রান্ট যেন জীবনের জয়গানে মত্ত। জীবনের মত ছবিও ওই সময় বর্ণময়, পরিপূর্ণ। স্ত্রীকে নানা জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত করে এঁকে চলেছেন একের পর এক ক্যানভাস। ক্যানভাস তো নয়, যেন রঙের বিচিত্র সমারোহ, উৎসব। কিন্তু পরবর্তীকালে শোচনীয় আর্থিক বিপর্যয় ও স্ত্রীর মৃত্যু রেমব্রান্টের মুখমণ্ডলে এনে দিয়েছে বেদনাজনিত এক গাম্ভীর্য।

দেউলিয়া ঘোষিত হবার তিনবছর পর করা এক আত্মপ্রতিকৃতিতে এ সত্যই উদ্‌ঘাটিত যে শিল্পীর জীবন ও মানসিকতায় ঘটে গিয়েছে বড় পরিবর্তন। তারপর যত সময় এগিয়েছে, নানা কষ্টের মধ্যেও আত্মানুসন্ধানে তাঁর অবিচল প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে প্রতিটি স্বচিত্রে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্টতর হয়েছে মুখমণ্ডল ও কপালের দীর্ঘায়িত কুঞ্চনে। তেইশ বছর বয়সের আত্মচিত্রে ছিল অজানা বিশাল জগত ও জীবনকে জানার আগ্রহ, জিজ্ঞাসা। মধ্যবয়স পেরিয়ে পরিণত বয়সের ছবিতে জ্বলজ্বল করে উঠেছে সেই জ্ঞানলব্ধ স্থৈর্য, প্রজ্ঞা। এ যেন শিল্পীসত্তার ক্রমোত্তরণের ইতিহাস, চলমান এক জীবনের দৃশ্যময় কাহিনী। ছবির ইতিহাসে শিল্পীজীবনের এমন গভীর সূক্ষ্ম ও মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ বিরল।

রেমব্রান্টের এই জীবনসংগ্রাম **পিটার পল রুবেন্সের** ছবিতে পাওয়া যাবে না। রুবেন্সের ছবি তাঁর জীবনের মতই বর্ণাঢ্য, সুখী, উজ্জ্বল। বিশেষ করে তিপান্ন বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর জীবনের সুখ ও শান্তিতে ক্যানভাস হয়ে উঠেছিল বর্ণময়, প্রাণোচ্ছল। ওই সময়কার গার্হস্থ্য জীবনের পরম আনন্দ ক্যানভাসের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে চিত্রিত করেছেন। স্ত্রীপুত্র সহ বাড়ীর বাগানে আত্মচিত্রে এই সুখ আর সমৃদ্ধির এক বিশ্বস্ত প্রতিফলন। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী হেলেনাকে নিয়েও পরপর সব প্রাণবন্ত ছবি এঁকে গেছেন। সেখানে হেলেনা কখনো ধর্মীয় বিষয়বস্তুর চরিত্র বা মডেল, কখনো বা পুত্র কোলে স্বয়ং উপস্থিত। জীবনের আনন্দই রুবেন্সের চিত্রসৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত।

জীবনের টানাপোড়েন **ভ্যান গঘের** প্রখর অনুভূতিশীল শিল্পীমনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, তুলিকে করেছিল সৃষ্টিচঞ্চল, তার তুলনা ছবির জগতে বিরল। ব্যতিক্রম একমাত্র পিকাসো। জীবন ও শিল্পের এমন নিবিড় যোগাযোগ ভ্যান গঘের ছবিকে তুলেছে এক চলমান আত্মজীবনী, বিশেষ করে জীবনের শেষ দিকে আর্লে পর্বের ছবিকে। ওই সময়কার নিসর্গচিত্র শুধুমাত্র নিসর্গের ছবি নয়, তা শিল্পীর মানসিক অবস্থার প্রতিফলন, a state of mind. দক্ষিণ ফ্রান্সের ওই অঞ্চলের আলোয় ভরা প্রকৃতির বিপুল বর্ণ-

প্রাচুর্যে যে প্রবল উচ্ছ্বাস ও আবেগ শিল্পীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতিটি ছবিতেই তার সোচ্চার প্রকাশ। জীবনের এই অল্প কয়েকটি দিন দুর্লভ অবিমিশ্র এক আনন্দে শিল্পীর মন ও ক্যানভাস ভরে ওঠে। ভাই থিওকে লেখা এক চিঠিতে পাই সেই আনন্দের অভিব্যক্তি—"Life is after all enchanting." ১৮৮৮তে করা The Starry Night সেই enchantment-এর এক অনবদ্য চিত্রায়ন। তারাভরা রাতের রমণীয় সৌন্দর্য পরম বর্ণময় হয়ে ধরা দিয়েছে ভ্যান গঘের কল্পনায়।

তবে ক্ষণস্থায়ী এই প্রশান্তি। কয়েকমাসের মধ্যেই আক্রান্ত হলেন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তীব্র মানসিক অস্থিরতায় যা তাঁর জীবনকে অপ্রকৃতিস্থতাজনিত বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত করা অনেকগুলো ছবিতে এই এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বস্ত ক্রমবিবরণ সহজলভ্য। গর্গ্যার সঙ্গে সংঘাতের ফলে উত্তেজনাবশে স্বকর্ণকর্তনের পর পাইপমুখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় যে স্বচিত্র আঁকেন তাতে রয়েছে সূচনার ইঙ্গিত। ১৮৮৯ সালে সেণ্ট রেমী মানসিক হাসপাতালে থাকতে আঁকা The Starry Night-এর অন্য একটি ক্যানভাসে পাওয়া গেল শিল্পীমনের ওই সময়কার উত্তাল বিক্ষোভ, অশান্তি। তারা, আকাশ সাইপ্রেস গাছ এসব নিয়ে ছবির সমগ্র পরিবেশে তাই তোলপাড়। ১৮৯০তে সেণ্ট রেমীতেই করা Country Road by Night ছবিতে চাঁদের গোলকটি আঁকলেন ঠিক উল্টো অর্থাৎ সূর্যের বিপরীতমুখী। রাস্তার পাশে শস্যক্ষেত এলোমেলো, যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত। আকাশও সমান অশান্ত। সেখানে পাশা-পাশি চাঁদ ও সূর্য, দুই-ই সমান উজ্জ্বল! অথচ গাছের ছায়া পড়েছে সূর্যের আলোয় নয়, চাঁদের আলোয়! আবার ঘোড়ার গাড়ির কোনো ছায়া নেই! ছবি এখানে শিল্পীর চূড়ান্ত মানসিক ভারসাম্যহীনতার দর্পণ। এটা মৃত্যুর কিছুদিন আগের কথা, মানসিক রোগের আক্রমণে তখন তিনি বিপর্যস্ত। মৃত্যুর দুমাস আগে করলেন সর্বশেষ আত্মপ্রতিকৃতি, সর্বশ্রেষ্ঠও বটে। তার পশ্চাৎপটে সবুজ ও নীল রঙের বিক্ষুব্ধ আলোড়নে অমর হয়ে রয়েছে এই উদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, বেদনার্ত শিল্পীসত্তার চূড়ান্ত পরিণতির অভিব্যক্তি।

অন্তিম ছবিগুলোতেও বেশ বোঝা যায়, শেষের সেদিন আগতপ্রায়। ক্যানভাসে তখন এসেছে অজস্র কালো পাখি, মেঘে ঢাকা ঝড়ের আকাশ। আসন্ন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় স্পষ্ট।

স্থায়ী, সুখী একজায়গার জীবন ভ্যান গঘের ভাগ্যে জোটেনি। নিঃসঙ্গ ক্লান্ত শিল্পী তাই অনেক দুঃখে ভাই থিওকে এক চিঠিতে অকপটে জানিয়েছিলেন—"I always feel I am a traveller, going somewhere and to some destination. If I tell myself that the somewhere and the destination do not exist, that seems to me very reasonable and likely enough" জীবনের এই চিরপথিকসত্তার প্রকাশ Country Road by Night ছবিটির পথপ্রান্তে দুই পথচারীর নিঃসঙ্গ পদচারণায়। হয়ত বুঝেছিলেন, দিন ফুরিয়ে আসছে। ছড়ানো এ জীবনের গভীর গোপন অনুভূতিটুকু চিত্রায়িত করে যাবার এই সময়।

ভ্যান গঘের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ এই নিদারুণ একাকীত্ববোধ। মনের সঙ্গী পাননি, বন্ধুর সঙ্গসুখে বঞ্চিত মন এই অভাববোধে পীড়িত হয়েছে জীবনের বেশির ভাগ সময়। ১৮৮৮তে করা বিখ্যাত Night Cafe ও Cafe Terrace at Night ছবি দুটি সেই বেদনার অব্যর্থ চিত্ররূপ। মানুষজন এখানে দূরে দূরে, তাদের চেনা যায় না। তাদের সঙ্গে দূরত্ব বোঝাতেই যেন ছবির সামনের দিক অনেকটা ফাঁকা। মানুষের সাহচর্যহীন শিল্পীমন তাই দূরের উজ্জ্বল তারাদের সান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। Cafe Terrace at Night ছবির বড় বড় রাতের তারা আর জনশূন্য গোল গোল টেবিল এই আকাঙ্ক্ষায় মিলেমিশে গেছে। Night Cafe-র কথায় ভাই থিওকে লিখেছিলেন, লাল আর সবুজের সাহায্যে আমি মানুষের নিদারুণ সব আবেগ প্রকাশ করতে চেয়েছি। এ ছবি আসলে শিল্পীর মনোজগতের অদম্য আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। লাল ও সবুজের বৈপরীত্যে তাঁর বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা সার্থক চিত্রভাষা খুঁজে পেয়েছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে করা শেষ ছবি Cornfield with Rooks প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন

তাতেও এই অনুভূতির চূড়ান্ত অনুরণন—"Knowing exactly what I wanted, I have painted three more big canvases since. They are vast field of wheat under troubled skies, and I did not need to go out of my way to try to express sadness and extreme loneliness."

আমার জীবনই আমার শিল্প, এমন অমোঘ এক ঘোষণা চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যাকে সবচেয়ে মানায়, তিনি **পিকাসো**। জীবনের নানা ছন্দের আলোড়ন, প্রতিটি দিকচিহ্ন ও মোড় ফেরা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে। গভীর আত্মবিশ্বাসে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, অন্যরা যেভাবে আত্মজীবনী লেখে, আমি সেইভাবে ছবি এঁকে যাই। আমার ছবিকে তাই আমার জীবনের ডায়েরীর পাতা হিশেবেই গণ্য করতে হবে। পিকাসোর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ডোরা মার একবার মন্তব্য করেছিলেন, পিকাসোর উত্তর-কিউবিস্ট যুগের যে কোনো পর্বে পাঁচটি জিনিস তাঁর জীবনযাপন ও শিল্পরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—কবিরা, বন্ধুবান্ধব, মহিলারা অর্থাৎ প্রেমিকারা, বাড়িঘর আর কুকুর। তখন থেকে তাঁর জীবন ও শিল্প প্রকৃত অর্থেই একাত্ম। ছবিই বলে দেয়, কখন কিভাবে জীবন ও মননে ঘটে গিয়েছে পরিবর্তন। বিশেষ করে স্ত্রী, প্রেমিকা ও বান্ধবীদের যেমন যেমন তাঁর জীবনে আসা যাওয়া, সেইভাবে চিত্ররীতিও পাল্টে গেছে। ভালবাসা ও সাহচর্যের উষ্ণ সুখানুভূতিজাত বর্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধতা ও বিচ্ছেদের বেদনা চক্রাকারে ক্যানভাসে ফিরে ফিরে এসেছে জীবনের বিভিন্ন সময়।

ছবিতে অনুভব করা যায় গতিময় এই জীবনের দুরন্ত স্পন্দন। প্রথমা স্ত্রী ওলগার সঙ্গে প্রেম ও বিবাহসুখের প্রভাবে পিকাসো নিওক্লাসিকাল চিত্ররীতি গ্রহণ করেন, গড়ে ওঠে মা ও শিশুর চিরন্তন বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনিন্দসুন্দর চিত্রমালা। তেমনি ওলগার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি ও ক্রোধ ছবিতে নিয়ে এল ভাঙচুর, কর্কশতা, নারীদেহের আকারে বিকৃতি, সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলার প্রভাবে অন্তর্জগতের অনুসন্ধান। আবার নতুন বান্ধবী মারি তেরেসের মুখ ক্যানভাসে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে

এসবের বদলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কোমলতা ও উত্তাপ লক্ষ্য করা গেল। পরবর্তী বান্ধবী ডোরা মারের মুখাবয়বকে করে তুললেন গের্ণিকা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্বের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যম। এখানে লক্ষণীয়, আত্মপ্রতিকৃতি নয়, প্রেমিকাদের অজস্র ছবিতেই তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বের ভালবাসা, কামনা বাসনা, বিতৃষ্ণা ও ক্রোধের প্রকাশ। আমার ছবিতে এইসব খবর আপনিই জানাজানি হয়ে যায়, বলেছিলেন পিকাসো। এরপর ডোরা মারের বিদায়, ফ্রাঁসোয়া জিলোকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু, কিছুদিন পর পুনরায় বিচ্ছেদ ও মানসিক অবসাদ এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে জ্যাকুলিনকে স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ—ব্যক্তিগত জীবনের এ সমস্ত তথ্যই সবিস্তারে বর্ণনা করা আছে ছবিতে। নিত্য নতুন প্রকরণ ও শৈলীর উদ্ভাবনে এবং প্রেমিকাদের দেহাবয়বকে সেইমত পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত করে পিকাসো এইসব পরিবর্তন চিত্রবদ্ধ করে রেখেছেন। ক্যানভাসে এইভাবে জীবন আর সৃষ্টি মিলেমিশে একাকার হয়ে বেঁচে আছে, থাকবে।

তবে শুধুমাত্র ঘরসংসার বা আশপাশের পরিচিত সীমিত বৃত্তের জীবন নয়, তার বাইরে বৃহত্তর জনজীবনের নানা স্মরণীয় ঘটনাও পিকাসোর জীবনকে স্পর্শ করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর শিল্পীমনকে। তাই স্পেনের গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ, বিশ্বশান্তির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা—এসব থেকে সৃষ্টির মহামূল্য রসদ সংগ্রহ করেছেন। এই ব্যাপক অর্থেও পিকাসোর জীবন ও সময়ের দর্পণ তাঁর ছবি। সামগ্রিক বিচারে বিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী তিনি।

নির্জন এক দ্বীপ

নির্জনতা শুধু কবি বা সাহিত্যিক নয়, চিত্রশিল্পীরও প্রিয় সহচর। নির্জনতার কবির মত নির্জনতার শিল্পী আখ্যাও দেওয়া যায় একাধিক স্বনামধন্য চিত্রশিল্পীকে। তাঁরা আত্মমুখী, অখণ্ড নির্জন অবসরের মধ্যে খুঁজে পান সৃষ্টির অফুরন্ত রসদ। বাইরের কোলাহলের জগত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে মগ্ন হয়ে যেতে ভালবাসেন নিজস্ব এক জগতে। ছবিতে চিরকালের মত ধরা থাকে সেই নির্জন একান্ত সাধনার পরিচয়টুকু। এক হিশেবে তা সাধনাই বটে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বহু বছর ধরে একাগ্রচিত্তে গড়ে তুলতে হয় শিল্পীর মানসলোক। তবেই তাঁর vision এক অখণ্ড রূপ নিতে থাকে। সৃষ্টি হয় সময়বিজয়ী শিল্প। মহান শিল্পীদের অনেকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হলেও এখানে আমরা বেছে নেবো সেই ক'জনকে যাঁদের জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সৃষ্টিশীল সময়টুকুর অনেকটাই কেটেছে নিজের বেছে নেওয়া একান্ত এক পরিবেশে, যাকে বলা যেতে পারে নানা মানুষের ভীড়, মতপার্থক্য থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন এক দ্বীপের মত, যেখানে শিল্পীই একমাত্র অধিপতি আর তাঁর শিল্প একমাত্র রাজমহিষী।

উনিশ শতকের নিসর্গচিত্রের কবি, প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্রকলার প্রধান উদ্‌গাতা ক্লোদ মোনের কাছে গিভার্নি ছিল সেই পরম কাঙ্খিত দ্বীপের মত। সেখানে সৃষ্টির অবসর, ধ্যানের সময় ছিল অফুরন্ত। মাত্র আড়াই মাইল জায়গার স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন জীবনের শেষ তেতাল্লিশ বছরের অবিস্মরণীয় সব সৃষ্টি। শিল্পীজীবনের শুরু থেকেই প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ বহু রমণীয় জায়গায় ছুটে গেছেন রঙ তুলি নিয়ে। প্রথমে ফ্রান্সের সর্বত্র, তারপর স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে ইউরোপের নানা নির্জন প্রান্তরে, বনাঞ্চলের সীমানায়, নদীর

তীরে। .খুঁজে ফিরছিলেন এক নিভৃত স্থান, একটানা কাজের পছন্দসই পরিবেশ।

অবশেষে ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চল গিভার্নিতে মন বসল। স্থিতু হল এতদিনের যাযাবর জীবন। নিজের মনের মত করে সাজালেন বিশাল বাগান, জলাশয়। তার ওপর তৈরী হল ছোট্ট জাপানী কাঠের সেতু। নীচে অজস্র বাহারি ফুলের সমাহার। রঙের উৎসব লেগে গেল যেন। সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদের উজ্জ্বল রকমারি আভা তাদের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করল অবর্ণনীয় রঙের সম্ভার। চারপাশের এত ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল মোনের অনুভব। তখন থেকে শুধু ওই বাগানেই জমা হতে থাকল শিল্পীর মহার্ঘ সব সঞ্চয়। ক্যানভাসে তখন তিনি কেবলমাত্র চিত্রশিল্পী নন, এক সুদক্ষ মালিও বটে। সযত্ন পরিচর্যায় রঙে রঙে গড়ে তুলছেন এক সাজানো বাগান। যেখানে মানুষ নেই, প্রকৃতিই নিজরাজ্যে স্বাধীন, সার্বভৌম। বয়স বাড়ার সঙ্গে দৃষ্টি-শক্তি, কর্মক্ষমতা, বাইরের জগতের পরিধি যত সঙ্কুচিত হয়ে এলো, ক্যানভাসে বিশাল থেকে বিশালতর বিস্তৃতিতে তত জাঁকিয়ে বসল অজস্র ওয়াটারলিলি, জাপানী সেতু, জলের ওপর প্রতিবিম্বিত নানা ফুল, সূর্যাস্ত, রামধনু, পপলার গাছের সারি। বছরের পর বছর মোনেকে তারা যুগিয়ে গেছে ছবির অফুরন্ত রসদ। প্রকৃতির কোলে অসীম নির্জনতায় সৃষ্টির নেশায় বিভোর শিল্পী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন বাগানে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের দিকে। এই মুগ্ধতাবোধ তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী ছিল। এই-রকম নিরবিচ্ছিন্ন নির্জনতায় প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে চেনা যায়। তাই হয়ত সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হাজারো গাছের মাঝে নিঃসঙ্গ উইলোর কান্না। ১৯১৯-এ এক মস্ত ক্যানভাসে আমাদের শোনালেন সেই Weeping Willow-র মর্মভেদী শব্দ। বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলার অনন্ত বিস্তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মোনের এইসব অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রমালায়।

উনিশ শতকের আর এক প্রবাদ পুরুষ পল গগ্যাঁও খুঁজে পেয়েছিলেন নির্জন সেই দ্বীপ। কৈশোর থেকেই মনের এক কোণে সযত্নে লালন করে রেখেছিলেন স্বাধীন সুখী আদিম এক স্বর্গভূমির স্বপ্ন, যা হয়ে উঠবে তাঁর স্বাধীন

নিশ্চিন্ত চিত্রসৃষ্টির আদর্শ আশ্রয়স্থল। তাঁর খোঁজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিশাল সমুদ্রে, জাহাজের নাবিক হয়ে। সেই টানেই প্যারিসের শহুরে জীবন, চাকরি, কাফেতে জমজমাট দীর্ঘ আড্ডা, বন্ধুবান্ধব. স্ত্রীপুত্র পরিবার এসব ত্যাগ করে ছুটে গিয়েছিলেন ব্রিটানী দ্বীপে। সেটা ১৮৮৬ সাল। সেখানকার আদিম অধিবাসী আর নিসর্গের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর নিবিড় সংযোগ। এখানেই প্রথম দেখা পেলেন কল্পনায় গড়া spiritual homeland-এর এক আদল। সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তাঁর শিল্পসৃষ্টি। লিখলেন—আমি ব্রিটানীকে ভালবাসি। সেখানে আমি বন্য আর আদিমের দেখা পেয়েছি। ওখানকার পাথুরে জমির ওপর আমার কাঠের জুতোর যে শব্দ হয় তাতে আমার ছবির জন্য যা চাইছি, সেই muffled, dull and mighty tone পেয়ে যাই। ছবিতে বোঝা গেল শিল্পীর জীবন ও শিল্পে ঘটে গিয়েছে এক বিরাট পালাবদল—নিজেকে আবিষ্কারের সূচনা।

এই খুঁজে পাওয়া চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে সুদূর তাহিতি দ্বীপে। শহরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যসভ্যতার ছোঁয়াচ বর্জিত এই আদিম প্রকৃতির মাঝে ছড়ানো ছিল শিল্পীমনের অজস্র খোরাক, তুলির জন্য বিচিত্র রঙ। ১৮৯০ সালে প্রথম দর্শনেই এই সবুজ দ্বীপের কুমারী সৌন্দর্য গগ্যাঁকে আকর্ষণ করে। শেষে ১৮৯৫ সালে ফ্রান্স ছেড়ে চিরকালের মত ওখানে ঘর বাঁধলেন, একাত্ম হয়ে গেলেন ওখানকার সহজ সরল অধিবাসী আর বিশাল সাগরঘেরা নিরালা প্রকৃতির সঙ্গে। তখন থেকে জীবনের শেষ ক'টি বছর ধরে ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে তাদের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি, এতদিনের চিত্রাদর্শের খানিকটা বাস্তবে পাওয়ার আনন্দোৎসব। যা চাইছিলেন তা করার অফুরন্ত সুযোগ আর পারিপার্শ্বিক প্রেরণা পেয়ে গগ্যাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করল। স্বপ্ন, বাস্তব আর কল্পনা মিলেমিশে সেসমস্ত ছবিতে তৈরী হল এমন এক বিচিত্র আবহ যা "something out of this world". ১৯০১ সালে আরো আদিম, অকৃত্রিম বিশুদ্ধ পরিবেশের সন্ধানে পৃথিবীর সুদূর প্রান্তের এককোণে, দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপ হিভা ওয়ার গভীর নির্জনে গড়লেন নীড়। বহির্জগত সভ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ওই অরণ্যময় নিরালায় তাঁর জীবন তখন

একাকী নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মত। সঙ্গী বলতে শুধু তাঁর ভৃত্য। রাত্রে সকলে যখন নিদ্রামগ্ন, গগ্যাঁ তখন একা লিখে যেতেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। দুবছর পর নিসর্গের এই স্বর্গরাজ্যের এক নিভৃত স্থানে চিরস্থায়ী আশ্রয় পেলেন নির্জন নিঃসঙ্গ শিল্পী।

ভ্যান গঘও তাঁর শিল্পীজীবনের সেরা ফসল ফলিয়েছিলেন প্রকৃতির একান্তে। ১৮৮৫ সাল থেকেই উজ্জ্বল রঙ আর আলোয় মাখামাখি জাপানী ছবির প্রতি তাঁর আকর্ষণ। প্যারিসে এসে এই ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হয়। মনে জন্ম নেয় এক প্রতিজ্ঞাবোধ—রৌদ্রালোকিত ঝলমলে প্রকৃতির নৈকট্যে সেই রঙ খুঁজে নিতে হবে, ফুটিয়ে তুলতে হবে নিজের ক্যানভাসে। Return to nature অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে ফিরে চল, প্রতিচ্ছায়াবাদের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ভ্যান গঘের কাছে তাই প্যারিসের বিবর্ণ স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া নয়, অজস্র তর্কবিতর্ক বাদানুবাদ মতভেদ নয়, প্রয়োজন ছিল এমন এক নিভৃত নিসর্গ যেখানে একাগ্র চিত্রসাধনায় ডুবে থাকতে পারবেন। কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ সময়ে অসময়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারবে না। রৌদ্রোজ্জ্বল দক্ষিণ ফ্রান্স তাঁর শিল্পীমানসে হয়ে উঠল দ্বিতীয় জাপানের মত। প্যারিস ছেড়ে ছুটে গেলেন আর্লেতে। জনহীন প্রকৃতির মাঝে সৃষ্টির নেশায়, কাজের উন্মাদনায় বিভোর হয়ে রইলেন। শহর থেকে বহুদূরে দিগন্তবিস্তৃত গমক্ষেত, পাহাড় আর সাইপ্রেস গাছ ঘেরা মাঠ, ফুলের নির্জন ঝোপঝাড় আর ফলের বাগানে সৃষ্টি হতে লাগল ভ্যান গঘের চিরস্থায়ী খ্যাতির সৌধ। সেখানে শুধু শিল্পী ও প্রকৃতির মধ্যে নিভৃত অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, গভীর যোগাযোগ। ভাই থিওর স্ত্রী স্মৃতিচারণে লিখেছেন—"Completely absorbed in his work as he is, he does not feel the burden of great loneliness that surrounds him at Arles........" নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতার বুঝি হাত ধরাধরি নৈকট্য। সঙ্গীহীন ভ্যান গঘের ছবিতে তাই নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে এত একাত্মতা।

পরবর্তীকালে সেন্ট রেমী মানসিক হাসপাতালে দুঃসহ হয়ে বুকে চেপে বসত নিঃসঙ্গতার ভার, যাকে থিওর স্ত্রী বলেছেন worse than the

greatest loneliness. এই নিরানন্দ পরিবেশে একমাত্র আনন্দ, বাইরের খোলামেলা প্রকৃতির নিরবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য, দুচোখ ভরে দেখা, ছবি আঁকা। সেণ্ট রেমী থেকে প্যারিসে ফিরলেন, কিন্তু টিঁকতে পারলেন না, পালিয়ে গেলেন একশ মাইল দূরে অভার্স গ্রামে, যাতে আবার কাজ শুরু করতে পারেন প্রকৃতির নিস্তব্ধ একাকীত্বে। তাঁর অন্তিম ছবি ক'খানা ওখানকার নিরিবিলি পাহাড়ঘেরা পরিবেশের সঙ্গে শেষ অন্তরঙ্গতায় রঙীন। স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যও বেছে নিলেন জনহীন শস্যক্ষেতের এককোণ। একাকী নিঃসঙ্গ শিল্পীর নির্জন চিত্রসাধনার হয়ত এই সমাপ্তিই স্বাভাবিক ছিল। ছোট ভাই থিও একবার লিখেছিলেন—"A quiet life is impossible for him, except alone with nature........". ভ্যান গঘের জীবন ও মৃত্যুতে এই কথাটির অমোঘ তাৎপর্য বার বার মনে আসে।

পল সেজানেরও আত্মআবিষ্কার ও আত্মবিকাশ লোকচক্ষুর আড়ালে। তাঁর ক্ষেত্রে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—সেই প্যারিস ছেড়ে যাওয়া, সেই নিরাপদ দূরত্বে একাকীত্বের সাধনা। "Isolation, that's what I deserve"—বন্ধু এমিল বার্নার্ডের কাছে এই অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শিল্পীমনের নিঃসঙ্গতার পরিচয়। ছবিতেও তাই। প্যারিসে শিল্পীজীবনের গোড়ায় সেজানের কপালে জুটেছিল সমালোচকের উপহাস, উপেক্ষা, সাধারণ দর্শকের উদাসীনতা। ১৮৭২-এ পিসারোর সঙ্গে ওঁর গ্রামে গিয়ে একত্রে বেশ কিছুদিন কাটান। প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগে উদ্দেশ্যহীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের পথ খুঁজে পেলেন। ১৮৮০ থেকে প্যারিস বন্ধুবান্ধব সবকিছু ছেড়ে নিজেকে সরিয়ে নিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভাঁসে। তখন থেকে দীর্ঘকাল সেখানেই চলল নিভৃত সাধনা। এক হিশেবে তা হল শিল্পীর আশ্রয়স্থল, ইংরাজীতে যাকে বলা যায় retreat. বিশেষ করে জন্মস্থান পাহাড়ঘেরা নির্জন গ্রামাঞ্চল এক্স-এ শেষ জীবনের সেরা বছরগুলো কাটিয়েছেন। তাঁর যুগান্তকারী অনেক ছবির প্রেরণা ওখানকার নিসর্গ। পাহাড়ের মত ছবিতেও সেজানের পরম কাঙ্খিত মজবুত গড়ন। আবার এই পাহাড় একাকী, মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। পাথর মানবিকতার ছোঁয়াচ

বর্জিত বলেই কঠিন, প্রাণহীন। ছবির পর ছবি জুড়ে এদের দ্বৈত উপস্থিতি শিল্পীর নিঃসঙ্গ নির্জনতার সার্থক প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবু এদেরই নিরবিচ্ছিন্ন নিভৃত সান্নিধ্যে রচিত হয়েছে জগত কাঁপানো চিত্রমালা। আধুনিক চিত্রকলার নতুন দরজা দোহাট করে খুলে গেছে।

সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন যিনি, সেই **পিকাসোকে** এই আলোচনার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা মনে হবে এক বিরাট অসঙ্গতি। তবু শেষ জীবনে বিচ্ছিন্নতার ঘেরাটোপের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এই জীবনশিল্পী—এ এক বিস্ময়কর সত্য। ১৯৫৫ থেকেই ক্রমশ জনসাধারণের উৎসুক, অতি উৎসাহী দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সৃষ্টির একাগ্রতায় ডুবে যেতে থাকেন। তাই বারবার বাসা বদল করে আত্মগোপন করেছেন পছন্দসই নির্জনতায়—কখনো কানে'র পাহাড়ের চূড়ায় এক ভিলাতে (১৯৫৫), কখনো প্রভাঁসের উপত্যকায় এক পুরনো দুর্গে (১৯৫৯), কখনো সাগর আর পাহাড়ঘেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত নোতর দামের এক বিশাল বাড়িতে (১৯৬১)। শেষোক্ত স্থানেই গড়ে তুললেন যাকে বলা যায় শেষ জীবনের শিল্পাশ্রম। সেখানে সঙ্গী বলতে শুধু স্ত্রী জ্যাকুলিন আর অতি আপনজনরা। জনবিরল দুর্গম সেই দুর্গে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। সেখান থেকে চমকপ্রদ সব শিল্পসৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে উদয় হতেন বাইরের উৎসুক জগতে।

এইভাবেই নির্জন নৈঃশব্দে গড়ে উঠেছে চিত্রশিল্পের নানা সুদৃশ্য ইমারত।

চিত্রসৃষ্টি ঃ ত্বরিতে অথবা ধীরে

ছবির ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, সৃষ্টির প্রক্রিয়া দ্বিবিধ—কখনো তা অতিদ্রুত, কখনো বা ধীর, দীর্ঘস্থায়ী। সেই হিশেবে শিল্পীদের আমরা দুটি দলে ভাগ করে নিতে পারি, জেনে নিতে পারি কিভাবে গড়ে ওঠে তাঁদের ছবির নিজস্ব এক জগত। কত দ্রুত অথবা কতটা সময় নিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

একাধিক বরেণ্য শিল্পীর মন আর তুলি সমান দ্রুতগামী। তাঁদের ক্যানভাসে যাবতীয় আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীমায়। কোনো বাধা বা দেরী সয় না। যাঁর ছবি আঁকার দুর্বার তাগিদ ও উন্মাদনাকে অবনীন্দ্রনাথ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেই **রবীন্দ্রনাথের** কথাই আগে আসে। প্রতিমা দেবী জানিয়েছেন—"তিনি যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, সে যেন বন্যার মতো তাঁর তুলির টানে বেরিয়ে আসত রূপের রেখা। চার পাঁচ খানা ছবি তিনি অনেক সময় দৈনিক শেষ করতেন, তবু যেন তাঁর তৃপ্তি হোত না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন—যেমন ভাঙ্গা কলম বা পেনসিল, যা তা কাগজের টুকরো—তাই দিয়ে হাত চলত। ভালো রঙের ধারও ধারতেন না, নানা প্রকার জিনিস দিয়ে চলত তাঁর আঁকা।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)

এই অস্থিরতা, এই দুর্দমনীয় প্রকাশশক্তির পেছনে কারণ একটাই—স্তূপাকারে জমে ওঠা অজস্র কল্পনার সবটুকু রঙে রেখায় যতদূর সম্ভব ধরে রাখা, পাছে দেরী করলে সময়ের সঙ্গে মন থেকে সেই মহার্ঘ রূপকল্পনা হারিয়ে যায় চিরতরে। "মনটা জোরে চলতে থাকে" যাঁর, সেই শিল্পীর এ তাড়না চিরকালের। সাধ্য কী তা উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বা অপেক্ষায় আটকে রাখেন। পাছে মনে জেগে ওঠা গানের কথা ভুলে যান, সঙ্গীদের

তাড়া লাগিয়েছেন তা শীগ্‌গীর লিখে নেবার জন্য। কিন্তু ছবির রূপকার তো তিনিই একা। তাই তেলরঙে ছবি আঁকার যে ধৈর্য দরকার তা তাঁর স্বভাবে ছিল না। বরং তাড়াতাড়ি শুকোয় যে জলরঙ আর জলনিরোধক কালি তাই ব্যবহার করেছেন। সৃষ্টিসুখের এই অপ্রতিহত উল্লাসে মোট আড়াই হাজার ছবি রচনা করে গেছেন জীবনের শেষ ক'টি বছরে।

নিজের ছবি আঁকার কথা প্রসঙ্গে ক্লোদ মোনে একবার বলেছিলেন—"I should like to paint as a bird sings". এই স্বতঃস্ফূর্ত চিত্ররীতিতে মোনে জীবনের গোড়া থেকে কাজ করে গেছেন। প্রকৃতির মাঝে খোলা পরিবেশে তার তাৎক্ষণিক চেহারার বৈচিত্র্য ত্বরিতে ক্যানভাসে তুলে রেখেছেন তখন থেকেই। এমনকি এক একটি তৈলচিত্রের জন্য দশ মিনিটের বেশি সময় দেননি। গিভার্নিতেও পরবর্তীকালে এক সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, একাধিক ক্যানভাস পরপর সাজানো, মোনে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছেন আর তাঁর পালিত কন্যা ঘরে ছুটে গিয়ে আরো ক্যানভাস নিয়ে আসছে। দিনের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে মোনের তুলিও চলছে দ্রুতলয়ে, যাতে বদলে যাওয়া আলোর রকমফের যতটা সম্ভব ধরে রাখা যায়। Morning on the Seine সিরিজ আঁকার সময় (১৮৯৭) তাঁর পাশে খোলা আকাশের নীচে সবসুদ্ধ চোদ্দটি ক্যানভাস রাখা ছিল। একটা থেকে আরেকটায় দ্রুত চলে যেতেন ক্রমাগত।

এটা লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে হাত চালিয়েছেন মনের ভেতরকার নানা কল্পনাকে ফোটাতে, সেখানে মোনের ব্যস্ততা দৃশ্যমান জগতে জমে ওঠা সৌন্দর্য আহরণে। রবীন্দ্রনাথের তুলিকে চালনা করেছে তাঁর মন, মোনের তুলিকে প্রধানত চোখ। এই চোখ দিয়েই মোনে পরপর ছবি সাজিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন প্রকৃতির এক পূর্ণাঙ্গ রূপ, যা তাঁর কাছে সত্যিকারের বাস্তব। তিনিই পেরেছেন জলের ওপর সূর্যাস্তের অজস্র বর্ণচ্ছটা ধরে রাখতে। পেরেছেন দিনের বিভিন্ন সময় খড়ের গাদা, পপলার গাছের সারি আর ক্যাথিড্রালের ওপর আলো ও রৌদ্রের বর্ণবৈচিত্র্য ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে। সময়ের দ্রুত প্রবাহকে চিত্রায়িত করার এমন সফল প্রচেষ্টা

ছবির ইতিহাসে কমই হয়েছে। তুলিকে সমান্তরাল গতিময়তায় পাল্লা দিয়ে না ছোটালে তা সম্ভব হত না মোনের পক্ষে।

ভ্যান গঘের সৃষ্টির দ্রুততায় মনের আবেগ আর বহির্জগতের অনুপ্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। কি স্টুডিওতে, কি প্রকৃতির সান্নিধ্যে, বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত তারা ছবির পরিসর দখল করে নিত। ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিরাম নেই, শান্তি নেই। আর্লে থাকতে মাদাম জিনোর একটি প্রতিকৃতি শেষ করেছিলেন মাত্র ৪৫ মিনিটে। রঙের ব্যবহারে আধুনিক চিত্রকলায় তা এক্সপ্রেশনিসম্ বা অভিব্যক্তিবাদের এক প্রধান অনুপ্রেরণা। বিশ্ববন্দিত Sunflower চিত্রগুচ্ছের জন্মও স্বল্পসময়ের ব্যবধানে। শিল্পীর নিজের ভাষায়, "the thing is to do the whole in one rush". ভ্যান গঘের অধিকাংশ ছবি এরকম এক অপ্রতিহত দুর্নিবার গতিতে আঁকা, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা সুপরিকল্পিত, আগে থেকে ভেবে নেওয়া।

আরেকদল শিল্পী আছেন যাঁদের চিত্রসৃষ্টির প্রক্রিয়া ধীর। ছবি তাঁদের কাছে এক গভীর ভাবনাচিন্তা, বিচার বিশ্লেষণের ফল। যা করতে চান তার অবয়ব তাঁদের মনে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। তারপর ক্যানভাসের কাজ যত এগোয়, একে একে খুলে যায় অনুভূতির এক এক দিক। ক্রমে সৃষ্টির এক সামগ্রিক আদল আসে। সময়ের এই ব্যাপ্তি কখনো কখনো বছর থেকে বছরে গড়িয়ে যায়। সৃষ্টির যাবতীয় অনুপ্রেরণা, মালমশলা জমা হতে থাকে অনুভবে, স্মৃতিতে। সেই সঞ্চয় থেকে একে একে তৈরী হয় এক একটি ছবি, নিজস্ব শিল্পীবোধে ঝাড়াই বাছাই করা সারাংশটুকুর পরিণত সব চিত্ররূপ।

যেমন **সেজান**। মোনের চিত্ররীতির বিপরীত দূরত্বে তাঁর অবস্থান। মিউজিয়ামের শিল্পকলার মত চিরস্থায়ী কিছু করা—এই ছিল সেজানের চিত্রসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের কথায়—"Nature is always the same, but nothing of it endures....Our art must give a sense of its duration, must make us feel that it is eternal." সুতরাং কোনো তাড়াহুড়ো নয়। প্রতিচ্ছায়াবাদীদের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে তড়িঘড়ি ক্যানভাসে তুলে ফেলা নয়। প্রকৃতির একটা ওপর ওপর

ধারণা নয়, চাই তার পূর্ণ উপলব্ধি। দীর্ঘ সময় নিয়ে নিসর্গের বৈশিষ্ট্যগুলো তাই বোঝবার চেষ্টা করেছেন, বিশেষভাবে এক্স-এর পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক দিকগুলো। তারপর ধীরে ধীরে, রঙে রঙে তার এক শাশ্বত, অমোঘ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যা "solid, durable."

এই দীর্ঘায়িত চিত্ররচনার স্টাইল তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে বহু সাধনায়। তাঁর রোমান্টিক শিল্পীমন, হাত, তুলি সব মিলেমিশে চাইত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে খুশীমত ছবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ভেতর ভেতর এই অদম্য তাগিদ প্রায়ই মাথা চাড়া দিতে চাইলেও সবসময় তাকে বেঁধে রাখতেন। তদানীন্তন এক ফরাসী শিল্পসমালোচকের ভাষায়, He imposes on his brush a faithful slowness. দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যে পাকা রাজ-মিস্ত্রীর মত একটার পর একটা ইট সযত্নে গেঁথে বানিয়েছেন চিত্রশিল্পে আধুনিকতার পাকাপোক্ত ভিত।

নগ্ন স্নানার্থীদের নিয়ে করা The Great Bathers এমনই এক মজবুত স্তম্ভ। ১৮৯৮ সাল থেকে শুরু করে সাত সাতটি বছর লেগে গিয়েছিল গড়ে তুলতে। নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, স্কেচ ও স্টাডির পর ১৯০৫ সালে এটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ পায়। আর করেছিলেন টেবিলে রাখা আপেল সমেত স্টিল লাইফ। সেজানের এই এক অতি প্রিয় বিষয়, ক্যানভাসে যা ঘুরে ফিরে এসেছে বহুবার। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর অন্যতমও বটে। কিন্তু ওই সব ছবিতে বিষয়বস্তু সাজিয়ে নেওয়াটা সেজানের পক্ষে গভীর ভাবনাচিন্তার ব্যাপার ছিল। অতি ধীর পদক্ষেপে তিনি এগোতেন। এতবেশি সময় নিতেন যে সাজানো সব ফল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত। বাধ্য হয়ে তাঁকে কৃত্রিম ফলের সাহায্য নিতে হয়। অসামান্য ধৈর্য আর একনিষ্ঠতায় এইভাবেই পৌঁছে যেতেন ছবির প্রাণকেন্দ্রে।

এই ধ্যানমগ্নতা, এই ধীর স্থির কাজের পদ্ধতি **লিওনার্দো দা ভিঞ্চির** চিত্রীসত্তায়ও মিশে ছিল। সারা জীবনে যে অল্প ক'টি ছবি করেছেন, তা সবই দীর্ঘ সময় নিয়ে। মোনালিসা শেষ করতে লেগেছিল চার বছর, লাস্ট সাপার তিন। তাঁর শিল্পীজীবন এক অন্তহীন অন্বেষণের কাহিনী।

সে অন্বেষণ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, নিখুঁত রূপকল্পের জন্য। পারফেকশনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন ছবিকে, তাই সন্তুষ্টির দ্রুততা স্থান পায়নি তাঁর মনে। নিজের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সূক্ষ্ম কল্পনার সঙ্গে সৃষ্টিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন অবিরাম। দীর্ঘ সময়ের সাধনা ছাড়া ছবিকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। ভাসারি লিখেছেন, লিওনার্দোর অভ্যাস ছিল, যা আঁকলেন তা নিয়ে প্রায় সারাদিন চিন্তাভাবনা করতেন। লাস্ট সাপার আঁকাকালীন এই বিলম্বে মিলানের ডিউকের কাছে লিওনার্দোর বিরুদ্ধে অভিযোগ যায়। এর উত্তরে লিওনার্দো ডিউককে যা বলেছিলেন তা ভাসারির বর্ণনা থেকেই তুলে দেওয়া যাক :

He explained that men of genius sometimes accomplish most when they work the least ; for, he added, they are thinking out inventions and forming in their minds the perfect ideas which they subsequently express and reproduce with their hands. এই ছিল লিওনার্দোর শিল্পদর্শনের মূল কথা।

জীবনের প্রথম দিকে মোনের সঙ্গে খোলা আবহাওয়ায় কাজ করার সময় **রেনোয়া** দ্রুত সাবলীল তুলি চালনায় ছবি শেষ করতেন, ছবির বাঁধুনির দিকে নজর থাকত কম। এই তাৎক্ষণিক চিত্ররীতিই প্রতিচ্ছায়াবাদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরবর্তীকালে The Umbrellas ছবিটি শেষ করতে লেগে গিয়েছিল কয়েকটি বছর। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ (মতান্তরে ১৮৮৬) এই ক'বছর ধরে ছবির বিস্তর অদলবদল করেছেন। লাইন, জ্যামিতিক গড়ন আর রঙ নিয়ে শিল্পীর ভাবনাচিন্তার বৈপরীত্য ছবির সর্বাঙ্গে। এছাড়া বিখ্যাত Bathers করতে নিয়েছিলেন তিন বছর—১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭।

শেষ বয়সে **ক্লোদ মোনে** নিজের বাগানে ক্যানভাস আঁকা শুরু করলেও তা শেষ করতেন দীর্ঘ সময় নিয়ে, স্টুডিওর মধ্যে। তখন সময় আর প্রকৃতিকে চোখে দেখে ধরার বদলে vision দিয়ে তৈরী করে নিতেন। তাঁরও মনে হয়েছিল, স্মৃতিতে যা জেগে থাকে, তা-ই বাস্তবের চিরস্থায়ী ইমেজ।

দেখ, এই আমি

শিল্পী নিজের মুখকে ক্যানভাসে দেখতে ভালোবাসেন। অবশ্যই আয়নায় দেখার মত নয়, নিজের মত। আর পাঁচটা ফরমায়েশী কাজের মত খদ্দের, সমালোচক, দর্শক বা অন্য কাউকে খুশী করার দায় এখানে নেই। আছে শুধু আপন শিল্পীপরিচয় প্রকাশের এক মুক্ত অবকাশ। এ এক আলাদা জগত যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, গভীর গোপন অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে অনন্য। তাই বরেণ্য চিত্রশিল্পীদের সৃজনকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার নিয়েছে অন্তরঙ্গ পরিচয়ে চিরউজ্জ্বল তাঁদের আত্মপ্রতিকৃতি। যা এক অর্থে আত্মকথাও বটে।

ছবির ইতিহাসে আত্মচিত্রের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। সময়ের সঙ্গে তার চরিত্রের বিবর্তনও ঘটেছে। বিভিন্ন যুগে তার বিভিন্ন রূপ। তবে স্বাধীন, একক, স্বতন্ত্র এক শিল্পকর্ম হিশেবে আত্মপ্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা জার্মান চিত্রকর ড্যুরারের তুলিতে। ১৪৯৮ সালে করা এক তৈলচিত্রে দেখা গেল, সাজ-সরঞ্জাম হাতে কাজে ব্যস্ত চিত্রকর নন, এখানে তিনি ভাববিহ্বল, চিন্তাশীল এক শিল্পী। এরপর ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের শিল্পীরা কুণ্ঠা ও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে স্বপ্রতিকৃতি সৃষ্টির স্বাধীনতায় মেতে উঠলেন। তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে শৈল্পিক স্বাধীনতা আর আত্মবিশ্বাসও বাড়তে থাকে। বিষয়বস্তু হিশেবে স্বমুখ হয়ে উঠে সমান আকর্ষণীয়। তৈরী হতে থাকে আত্মচিত্রের পরম্পরা। তবে আমাদের দেশে এর সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীতে। তার আগে শিল্পী থাকতেন নেপথ্যে, রঙ ও রেখার কুশলতায়ই তাঁর যাবতীয় পরিচয়ের প্রকাশ। বিশেষত মুঘল ও অন্যান্য ধারার চিত্ররাজি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠত একাধিক শিল্পীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তাই ছবিতে শুধু নিজেকে তুলে ধরার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি।

আত্মচিত্রের আলোচনায় সর্বাগ্রে স্মরণীয় যিনি, সেই **রেমব্রাণ্ট** সারা জীবনে ষাটটিরও বেশি আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন। তাঁর আগে বা পরে নিজেকে নিয়ে এত আঁকাআঁকি আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, শৈল্পিক সার্থকতায়ও রেমব্রাণ্টের ওই ছবিগুলো অনন্য। আমরা দেখেছি, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ভরা তাঁর জীবনকে পড়ে নেওয়ার এক অমূল্য দলিল সেসব স্বচিত্র। এখানে শুধু ১৬৬০ সালের Self Portrait with a Pallete ছবিটির কথাই ধরা যাক। শিল্পী ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে, এক হাতে রঙের প্যালেট, অন্য হাতে একগুচ্ছ ব্রাশ। ওই সময়টা রেমব্রাণ্টের জীবনের এক সঙ্কটময় অধ্যায়। আর্থিক অনটনে জর্জরিত, তার ওপর 'ক্লডিয়াস সিভিলিসের ষড়যন্ত্র' শীর্ষক ছবিটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অপমানিত রেমব্রাণ্ট ছবির জন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে রাজি হলেন না, যদিও অর্থের প্রয়োজন তখন খুবই জরুরী। ফরমায়েশী কাজের টাকার চেয়েও শিল্পীর স্বাধীনতা তাঁর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। সেকথা বোঝাতেই প্রতিকৃতিতে দৃঢ় হাতে ধরা ছবি আঁকার নানা সাজসরঞ্জাম। মুখমণ্ডলে অকাল বার্ধক্যের ছাপ থাকলেও তা ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা: হাজারো সঙ্কটে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তি মরে না। রেমব্রাণ্টের সমগ্র শিল্পীজীবনের এই মূল সত্যটির সগর্ব ঘোষণায় এ ছবি চিরন্তনের মর্যাদা পেয়েছে।

তবে নিজের মুখ শুধু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ বহন করে না। শিল্পীর কল্পনা ও vision-এর চিত্রগত প্রকাশেরও তা এক বিশিষ্ট মাধ্যম। যেমন ১৪৯৮তে করা **ড্যুরারের** আত্মচিত্রটি। এখানে শিল্পীর ভক্তিভাবনা ও ধর্মচিন্তার অভিনব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নিজের মুখাবয়বের সঙ্গে যীশুর দীর্ঘ কুঞ্চিত আলুলায়িত কেশরাজির সংযোগে যীশুর লাঞ্ছিত অথচ ভাববিহ্বল ছবিটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। যেন নিজেই স্বয়ং যীশু। দশ বছর পরে আঁকা আর একটি স্বচিত্রেও যীশুর দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজের মানসিক যন্ত্রণা এক করে দেখার প্রয়াস চোখে পড়ে। এর পাশে **গগ্যাঁর** Self Portrait with a Halo (১৮৯০) ছবিটির মেজাজ বিপরীত মেরুর। সেখানে গগ্যাঁ নিজেকে দেখিয়েছেন বাইবেলে কথিত আদম ও ইভ কাহিনীর শয়তান হিশেবে।

ধর্মবিশ্বাসী খৃষ্টান তিনি কোনদিনই ছিলেন না, পবিত্র ক্রুশকে একবার লাথিও মেরেছিলেন। শয়তানরূপে নিজেকে কল্পনা করে নিতে তাই তাঁর বাধেনি। উল্টে এই প্রতিমূর্তিকে মহিমান্বিত করতে মাথার ওপর এক বলয় এঁকেছেন। ছবির পশ্চাৎপট ঘন লাল। এ হল নরকের লাল। আপেল আর সাপও রয়েছে। মানুষের পতনে তাঁর ভূমিকার প্রতীক এরা। শিল্পীর প্রতীকী চিত্র-ভাবনার এ আর এক বিচিত্র দিক।

নিজস্ব স্বভাব ও ধ্যানধারণার প্রতিচ্ছবি যখন শিল্পী অন্য কোনো চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পান, তাঁর মনে জন্ম নেয় এক একাত্মবোধ, সেই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখার প্রয়াস। শিল্পীজীবনের একেবারে গোড়ার দিকে প্যারিসে থাকতে **পিকাসোর** এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওই সময় নিজেকে ভাঁড় হিশেবে দেখিয়ে একাধিক আত্মচিত্র করেছিলেন। ভাঁড়ের কাজ লোক হাসানো। হেঁয়ালি, কৌতুক, ব্যঙ্গ, মিথ্যা কথা ইত্যাদির সাহায্যে সত্যকে প্রকাশ করা। সে গরীব দুঃখী দীন মানুষেরও বন্ধু। পিকাসোর মনে হয়েছিল এইসব তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খুব মিলে যায়। তাই স্যার রোল্যাণ্ড পেনরোজের মতে, আত্মচিত্রে তাকে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতীক বলে দেখিয়েছেন।

মুখ মনের প্রতিচ্ছবি, এই পুরনো প্রবাদের সার্থকতা **ভ্যান গঘের** আত্মচিত্রে যতটা, তেমনটি বুঝি আর কারো ছবিতে নয়। মনোজগতের দুর্নিবার আবেগ অনুভূতি আর তোলপাড় প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বমুখ। Self Portrait with Grey Felt Hat-এ (১৮৮৭) তাই চোখের চারপাশে, মুখাবয়বের সর্বত্র এমনকি পশ্চাৎপটেও আবেগতাড়িত বর্ণ-প্রয়োগের স্বাক্ষর। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে শিল্পীর অদম্য ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিফলন। তেমনি আর্লে আসার পর গগ্যাঁর জন্য আঁকা এক আত্মচিত্রে সেই মুখমণ্ডলই হল রোদে পোড়া লাল, প্রায় বর্ণহীন, কালচে। বোঝা গেল, তাঁর স্বপ্নের দক্ষিণদেশের প্রখর হলুদ রোদ অনুভূতিশীল শিল্পীমনে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এই প্রবল আবেগের বিপরীতমুখী সংঘাতে ভ্যান গঘ দ্রুত মানসিক ভারসাম্য-হীনতার দিকে এগিয়ে যান। কাটা কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় করা এক

প্রতিকৃতিতে জানালেন তার প্রথমটা। মৃত্যুর দুমাস আগে সর্বশেষ স্বচিত্রে পাওয়া গেল সেই যন্ত্রণার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

শিল্পীরা জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পোড়া নিজেদের ভাঙ্গাচোরা মুখ আঁকতে ভালবাসেন ; পরিণত বয়সের দুঃখময় আত্মোপলব্ধিই তাঁদের সত্যিকারের আত্মচিত্রায়নের প্রেরণা—এই মত যাঁরা পরম বিশ্বাসে আঁকড়ে থাকেন, রুবেন্স আর ভ্যান ডাইক তাঁদের কাছে এক অন্য জগতের প্রতিনিধি। সে জগত আনন্দের, উজ্জ্বল সৌন্দর্যের। **রুবেন্সের** একাধিক আত্মপ্রতিকৃতিতে এই পরিচয়ই বড়। ১৬০৯ সালে প্রথমা স্ত্রী ইসাবেলা ব্রান্টকে সঙ্গে নিয়ে করা ছবিতে রুবেন্স এক সুখী আত্মতৃপ্ত মানুষ। রঙের ব্যবহার আর সহজ অভিব্যক্তিতে রয়েছে শান্তিময় সুখী জীবনের নিশ্চয়তা। পরবর্তীকালে দ্বিতীয়া স্ত্রী হেলেনার সঙ্গে আরেক ছবিতেও তাই। শিল্পী সেখানে ধনী সুখী এক গৃহস্বামী। এমনকি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শেষ ছবিটি দুঃখজর্জর নয়। বার্ধক্যের ছাপ থাকলেও তাতে একটা মর্যাদাবোধ ফুটে উঠেছে। একদা একজন সফল কূটনীতিক ছিলেন একহাতে তলোয়ার দিয়ে তা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি। তেমনি রুবেন্সের একদা ছাত্র **ভ্যান ডাইকের** ১৬৩০ নাগাদ আঁকা স্বপ্রতিকৃতি বেদনায় বিদীর্ণ, ভাঙ্গাচোরা বার্ধক্যের ছবি নয়, তা যৌবনের স্বাভাবিক লালিত্যে উজ্জ্বল। সহজ ভঙ্গী, হাত আর আঙুলের আভিজাত্যপূর্ণ গড়ন এবং শিল্পীসুলভ চেহারা ছবিতে এক রোমান্টিক আমেজ এনেছে। আসলে শিল্পীরা জীবনীশক্তিতে উচ্ছল নিজেদের ছবি দেখতেও সমান ভালবাসেন। সত্যের এদিকটা অর্থাৎ জীবনের আনন্দটুকু তাঁরা অস্বীকার করবেন কী করে?

আত্মপ্রতিকৃতি অবশ্য কখনো কখনো নৈর্ব্যক্তিকও হয়ে পড়ে। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি নয়, শিল্পীর চিত্রগত নানা ভাবনাচিন্তাই সেসবের প্রধান উপজীব্য। **পল সেজানের** একাধিক ছবিতে এটা ঘটেছে। তাঁর চিরন্তন দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মানসিক দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার বিশেষ প্রতিফলন তাতে নেই। ছবির আবেদন প্রধানত চিত্রগত, চিত্রাতীত ব্যক্তিগত আবেগের ছোঁয়া সেখানে অনুপস্থিত। নিজের মুখ ক্যানভাসে ছবির প্রয়োজনই মিটিয়েছে। **পিকাসোর** ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁর কাজের যা বিশাল

পরিধি ও বৈচিত্র্য, সে তুলনায় নিজেকে অল্পই এঁকেছেন। তার মধ্যে শিল্পী-জীবনের প্রথমদিকেই বেশির ভাগ করা। ১৯০৬ সালের প্যালেট হাতে ছবিটির কথা ধরা যাক। আসন্ন কিউবিস্ট চিন্তাধারার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিশেবে নিজের মুখ আর শরীরকে ব্যবহার করা হয়েছে এই আত্মপ্রতিকৃতিতে। পরের বছর আরেকটি চিত্রে পাওয়া গেল প্রাচীন স্পেনীয় ভাস্কর্য আর নিগ্রো মুখোশে তাঁর তৎকালীন আগ্রহের প্রতিফলন। অস্বাভাবিক বড় দুটি চোখ আর মুখের গড়নে নিগ্রো মুখোশের আদল। রঙের জাদুকর মাতিস ১৯০৬ সালেই আঁকলেন নিজেকে। তাতে চোখ চশমাহীন, মুখভর্তি দাড়ি, গায়ে আড়া-আড়ি ডোরাকাটা গেঞ্জি। তিনি সেই সময় ফবগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ, রঙের ব্যবহার ও প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বের জন্য শিল্পমহলে যাদের পরিচিতি wild বা বন্য নামে। ফব আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা বোঝাতে শিল্পীর এই টান টান, আদিম মুখ আঁকা। যেন তা প্রচলিত নিয়মকানুনের বেড়াজালমুক্ত অরণ্যের অধিবাসীদের মতই স্বাধীন, স্বাভাবিক।

তবে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেও আত্মচিত্র আঁকা হয়েছে। যেমন ১৪৯৩ সালে করা ড্যুরারের ছবিটি। ভাবী স্ত্রীকে বাগদানের স্মারক হিশেবে উপহার দেওয়ার জন্য এঁকেছিলেন। শিল্পীর হাতে একটি চারাগাছ, জার্মান ভাষায় যার নামের অর্থ পুরুষের বিশ্বস্ততা। বিয়ের আগে পানিপ্রার্থীর গভীর অনুরাগ জানানোর এক মাধ্যম হয়ে উঠেছে স্বচিত্র।

নিজের সম্পর্কে এক শৈল্পিক নির্মোহ ঘিরে ছিল উনিশ শতকের অন্যতম সেরা ফরাসী চিত্রী আঁগ্রেকে। অনবদ্য দৃষ্টিনন্দন সব ক্যানভাস উপহার দিলেও নিজের মুখে কোনোরকম আবেগ বা সৌন্দর্য আরোপ করেননি। ১৮৬৪তে করা এমনই এক স্বচিত্রে সমগ্র মুখমণ্ডল আবেগবর্জিত, কঠিন। রঙ ও ডিটেলের কাজও তেমনি বাহুল্যহীন। এ যেন আত্মসমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে অন্তঃস্থল খুঁটিয়ে দেখা। এর পাশে উনিশ শতকেরই ফরাসী চিত্রকর দুনিয়ে রুশোর এক প্রতিকৃতি (১৮৯০) আত্মপ্রচারে সরব। নিজেকে দেখিয়েছেন একজন অতিকায় মানুষ, যার চারপাশে প্যারিস শহরের নিসর্গ, মানুষজন এমনকি ইফেল টাওয়ার পর্যন্ত ছোট্ট দেখায়। হাতে সযত্নে ধরা শিল্পীর

প্রশস্তিপত্র। অর্থাৎ বিশাল শিল্পপ্রতিভার কাছে আর সবই নগণ্য, এমন এক কল্পনার সগর্ব প্রচারে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। গোড়ার দিককার চিত্রকরদের আত্মকুণ্ঠার সঙ্গে এ ছবির মেজাজের ফারাক দুস্তর।

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতিকে অবশ্য উপরোক্ত কোনো ধারার সঙ্গে মেলানো শক্ত, কেননা সেসব তাঁর নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট, যা একাধারে অদ্ভুত ও রহস্যময়। তবে যেভাবেই আঁকুন না কেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের অতি-পরিচিত মুখকে সহজেই চেনা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, নিজের মুখের আদলকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে অন্য কেউই এযাবৎ এমন কোনো প্রতিকৃতি আঁকতে পারেননি যাতে তিনি সগর্বে বলতে পারেন—এই দেখ, এ আমার শিল্পীসত্তার আসল ছবি। রক্তমাংসের জান্তব মুখের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, পরিচয় নেই।

এই আমরা

শিল্পী শুধু নিজের ছবি আঁকেন না। তিনি ভালবাসেন নিজেদের ছবিও। নিজেদের অর্থে অন্য শিল্পীদের, যাঁদের সঙ্গে রয়েছে নিবিড় আত্মীয়তা-বোধ, বা বলা ভাল আত্মিক যোগ। এই যোগাযোগ কখনো ব্যক্তিগত, কখনো বা প্রথাপ্রকরণগত। তাই অপর কোনো শিল্পীর অবয়ব নিজের ক্যানভাসে যখন চড়ান, তখন বোঝা যায় তা তাঁর কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা, ভালবাসা অথবা বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ। শিল্পী নিজেই তখন হয়ে ওঠেন সৃষ্টির রসদ, প্রেরণা। এ শিল্পীর চোখ দিয়ে শিল্পীকে দেখা, বুঝিবা চেনাও। রসিকজনের কাছে দুজনেরই নতুন এক পরিচয় ফুটে ওঠে।

আর্লেতে নিঃসঙ্গ ভ্যান গঘের সামান্য কয়েকজন বন্ধুর একজন ছিলেন বেলজিয়ান শিল্পী বক্। ওঁকে নিয়ে ভ্যান গঘ তেলরঙে এঁকেছিলেন Portrait of an Artist Friend (১৮৮৮)। এ প্রসঙ্গে ভাইকে এক চিঠিতে জানান—"I want to put into the picture my appreciation, the love that I have for him." শিল্পীর আঁকা শিল্পীর প্রতিকৃতি মূলত এই appreciation-এর ছবি। এই তাগিদেই গড়ে ওঠে পারস্পরিক চিত্রায়নের বহুমূল্য নজীর।

শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এযাবৎ বেশ কিছু স্মরণীয় ছবি আঁকা হয়েছে। রাফায়েলের বিশ্ববন্দিত The School of Athens ফ্রেসকোটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৫০৮ সালে রোমে আসার পর পোপের কাছ থেকে এক চ্যাপেলে ফ্রেসকো করার বরাত পেয়ে যান। ঠিক ওই সময়ই মাইকেল অ্যাঞ্জেলো রোমে সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদ অলঙ্করণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পোপের সঙ্গে মতবিরোধে প্রথম ভাগের কাজ অসমাপ্ত রেখে ফ্লোরেন্সে চলে যান। সেই কাজের ব্যাপ্তি, বিশালতা আর সৌন্দর্য রাফায়েলকে কতটা

প্রভাবিত করেছে তা বোঝা গেল ১৫০৯ থেকে ১৫১১-র মধ্যে করা ওই ফ্রেসকোতে। যে majesty আর grandeur এতদিন খুঁজে ফিরছিলেন, সর্বত্র তাঁরই প্রকাশ। দেওয়ালের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে চিত্রিত করলেন আলোচনায় ব্যস্ত অমর সব চিন্তানায়ক, দার্শনিক, পণ্ডিত ও কবিদের—প্লেটো, অ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, ইউক্লিডকে। আর যাঁর কাজ দেখে এই সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সেই মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে শ্রদ্ধা জানালেন বড় এক প্রস্তরখণ্ডে হাত রেখে চিন্তামগ্ন দার্শনিক হিশেবে চিত্রিত করে।

সেজানভক্ত মরিস দেনিসের Homage to Cezanne (১৯০১) -এ এই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি একটু অভিনব, সরাসরি ঃ ইজেলে রক্ষিত সেজানের এক স্টিল লাইফ ঘিরে দাঁড়িয়ে দেনিস স্বয়ং ও অন্য শিল্পীবন্ধুরা। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে সেজানের মুখাবয়ব নয়, তাঁর আঁকা এক ছবিই শ্রদ্ধা জানাতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফর্মই যে আধুনিক ছবির প্রাণ, সবচেয়ে জরুরী উপাদান সেজানের এই যুগান্তকারী অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেনিস এইভাবে জানিয়েছেন।

নন্দলাল বসু 'আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ' ছবিটি ১৯২৬ সালে গুরুকে তাঁর জন্মদিনে এঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথই নন্দলালের তুলিতে মুখ্য। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং বজ্রাসনে বসে আছেন। এক হাতে তুলি, অন্য হাতে কাগজ। সামনে উঁচু জলচৌকিতে রঙের নানা পাত্র ও তুলি। শরীর সোনালী রঙে আঁকা, গায়ে শাদা চাদর জড়ানো। বসার ভঙ্গী ঋজু। অনেকটা যেন ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তির মত সমাহিত। যেন চিত্র-সাধনায় মগ্ন এক সাধক। সব মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথের এক মহিমান্বিত রূপ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথও শিষ্য নন্দলালের প্রতিকৃতি করেছিলেন প্যাস্টেলে। সেখানে কিন্তু আবেগের চাইতে ছবির উপাদানই বেশি।

শিল্পীরা যখন একই কর্মযজ্ঞে সামিল, সেই উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে জন্ম নেয় প্রতিকৃতি। প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্ররীতির প্রথম দিককার দুই রূপকার ক্লোদ মোনে ও রেনোয়া একত্রে একই বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকটি বছর। ফলে দুজনের স্টাইলে গড়ে ওঠে

এক সাদৃশ্য। সেই সঙ্গে শিল্পীমনের নৈকট্য, আত্মীয়তা। বন্ধু ও সহকর্মী হিশেবে মোনে তাই রেনোয়ার ছবির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন একাধিকবার —কখনো ইজেলের পাশে অথবা বাড়ির বাগানে অঙ্কনরত, কখনো বা ঘরে পড়াশুনায় মগ্ন। অন্তরঙ্গতায় রঙীন, প্রাণবন্ত সেসব ক্যানভাস।

বয়সে বড় হলেও এডুয়ার্ড মানে এই দুজনের কাজ উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ১৮৭২ সালে সেইন নদীর ধারে এক জায়গায় চিত্রসাধনায় ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ওঁদের প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্ররীতিতে প্রভাবিত হয়ে পড়তে দেরী হয়নি মানের। দুবছর ছিলেন সেখানে। ওই সময় নবীন মোনের কর্মচাঞ্চল্য ও নিষ্ঠা তাঁকে মুগ্ধ করে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতিতে করা এক ছবি। সেখানে মোনে জলের উপর নৌকায় ক্যানভাসে তুলির আঁচড় দিতে ব্যস্ত। সহযোগিতা সহমর্মীতায় পরিণত হয় এইভাবেই।

তৎকালীন তরুণ ফরাসী চিত্রকর বাজিল প্রসঙ্গে এই কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। স্বল্পায়ু বাজিল গোড়া থেকেই প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্রকরদের বিশেষত মোনে ও রেনোয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ছবি আঁকায় মগ্ন তুলি হাতে বাজিলের একটি অনবদ্য প্রতিকৃতি রেনোয়া ১৮৬৭ সালে করেছিলেন, যা রসিকজনের তারিফ কুড়োয়। বাজিলও তরুণ রেনোয়াকে আঁকেন। এই একাত্মবোধ থেকে জন্ম নেয় ১৮৭০-এ বাজিলের করা বিখ্যাত গ্রুপ ছবি Studio of the Artist. নিজের স্টুডিওর মধ্যে একাধিক শিল্পীর সমাবেশ—এক বিশাল ক্যানভাস দেখছেন মোনে, পাশে এডুয়ার্ড মানে, রেনোয়া সাহিত্যিক এমিল জোলার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। সেবছর প্রুশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধে বাজিলের মৃত্যু হয়। পরে মানে ওই ছবিতেই রঙ তুলি হাতে বাজিলের এক পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকে দেন, যেন ছবির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে আর সকলের সঙ্গে তিনি রয়েছেন, থাকবেনও চিরকাল। অকাল প্রয়াত প্রতিভাবান এক তরুণের প্রতি প্রবীণ শিল্পীর এও এক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফব ও কিউবিস্ট শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যেও একইভাবে পারস্পরিক চিত্রায়ন ঘটেছে। ১৯০৫ সালে ফব গোষ্ঠীর দুই প্রধান

প্রবক্তা মাতিস ও দের্যাঁ একে অন্যের প্রতিকৃতি করেছিলেন নিজ নিজ রীতিতে। শিল্পী নিজেই এখানে শিল্পের উপাদান, রঙ নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপলক্ষ। পিকাসোর মুখও তেমনি ১৯১২তে জুয়ান গ্রিসের কিউবিস্ট ফর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনার খোরাক হয়েছিল। গ্রিসের তখন কিউবিসমে সবে হাতেখড়ি হয়েছে। আর পিকাসো তার পুরোধা। সেই অর্থে পিকাসোর রীতিতে তাঁর প্রতিকৃতি করা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোও বটে।

প্রতিচ্ছায়াবাদী মহিলা শিল্পী বার্থ মরিসোর সঙ্গে এডুয়ার্ড মানের সম্পর্ক ছিল অনেকটা নিবিড় এবং জটিল। অনুভূতিপ্রবণ মরিসো মানের স্টুডিওতে একাধারে মডেল ও ছাত্রী হিশেবে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। সেই সময় পারস্পরিক প্রভাবে গড়ে ওঠে এক নিবিড় সম্পর্ক। মরিসোকে নিয়ে মানে একাধিক প্রতিকৃতি করেন যা আবেগঘন, দৃষ্টিনন্দন। তার মধ্যে The Balcony-ই (১৮৬৯) সবচেয়ে বিখ্যাত। ব্যালকনিতে বসা মরিসো সেখানে চাপা আবেগে জ্বলজ্বল এক নারীমূর্তি। অন্য একটি মহিলার সস্তা সৌন্দর্যের পাশে তা আরো চোখে পড়ে।

কখনো কখনো শিল্পীর ভাববিহ্বল মূর্তিও নাড়া দেয় শিল্পীমনকে। হল্যাণ্ড থেকে প্যারিসে আসার পর ভ্যান গঘের শিল্পীমানসে ঘটে যায় দ্রুত পরিবর্তন। বিভিন্ন শিল্পী, নতুন মতবাদ ও আদর্শের সঙ্গে তখন পরিচিত হচ্ছেন, তার মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজের রাস্তা। কাফেতে শিল্পীদের মহামেলায় চলত এই অনুসন্ধান পর্ব। ভ্যান গঘ স্বভাবতই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত, উজ্জীবিত, বিচার বিশ্লেষণে মগ্ন। ১৮৮৭তে কাফেতে বসে থাকা শিল্পীর এ চেহারা তুলুজ লোত্রেকের চোখে পড়ে যায়। এ সেই লোত্রেক, যাঁর জীবন ও শিল্পের অনেকটাই জুড়ে প্যারিসের কাফে, রেস্তর্যাঁ। লোত্রেক স্বভাবসিদ্ধ টানা টানা লম্বা রঙীন মোটা রেখা দিয়ে জীবন্ত করে তুললেন ভ্যান গঘের চিন্তান্বিত, আবেগবিহ্বল প্রতিকৃতি। মাধ্যম হল প্যাস্টেল রঙ, যা জীবনে অল্পই ব্যবহার করেছেন। আর তুলির টান প্রতিচ্ছায়াবাদীসুলভ, হয়ত ভ্যান গঘের প্রভাবে।

পরবর্তীকালে আর্লেতে গগ্যাঁর সঙ্গে একত্রে থাকার সময় এই উত্তেজনা, উন্মাদনা বাড়ে। কতকটা গগ্যাঁর সঙ্গে সংঘাতের ফলে, কতকটা চিত্রসৃষ্টির দুর্দম

তাগিদে। সেই সময় সূর্যমুখী ফুল আঁকায় মগ্ন শিল্পীর এক প্রতিকৃতি গগ্যাঁ করলেন। ছবিটি সম্বন্ধে ভ্যান গঘের প্রতিক্রিয়া এই রকম—"....it was really me, very tired and charged with electricity as I was then". (সেন্ট রেমী থেকে ভাইকে লেখা চিঠি)। মতপার্থক্য ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতের মধ্যেও সৃষ্টির নেশায় উন্মত্ত, বিভোর শিল্পীর মনের টেনশনটুকু ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন গগ্যাঁ।

শিল্পীর মুখ অন্যের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে। দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বা idea চিত্রায়িত করার অনুপ্রেরণা তখন শিল্পীর মধ্যে অদম্য হয়ে ওঠে। বেলজিয়ান শিল্পী বন্ধু বক্‌কে দেখে ভ্যান গঘের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বক্ তাঁর চোখে একজন "young man with the look of Dante". চিঠিতে জানিয়েছেন কিভাবে তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠল কল্পনার এক বাস্তব প্রতিকৃতি। "Well, thanks to him I have at last a first sketch of the picture which I have dreamt of for so long—the poet. He posed for me. His fine head with that keen gaze stands out in my portrait against a starry sky of deep ultramarine...."

তবে শুধু কল্পনা নয়, শিল্পীমনের বাস্তব অবস্থারও প্রতিফলন এভাবে হতে পারে। ১৮৬৮ সালে নিজের দেশ এক্স-এর এক পরিচিত বয়স্ক শিল্পীকে আঁকতে গিয়ে সেজানের নিজের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল। ওই সময়টাতে সেজানের শিল্পী জীবনে এক দিশেহারা অবস্থা। কিছু করতে পারছেন না। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর হতাশায় ভুগছেন। তখন বামনাকৃতি ওই প্রবীণ শিল্পীর পঙ্গু শরীর দেখে তাঁর মনে হল, এ আসলে নিজের অক্ষমতারই এক জীবন্ত প্রতীক। সেই সঙ্গে অসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতারও। ছবিতে দেখালেন রাজসিংহাসনের মত জমকালো এক চেয়ারে জমকালো পোষাকে ওই শিল্পী উপবিষ্ট, নামও তাঁর ইংরাজি emperror-এর কাছাকাছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পঙ্গু শরীরে তা বেমানান। সেজানের আত্মক্ষোভ আর বিদ্রূপের এ এক অব্যর্থ চিত্ররূপ। অন্য শিল্পীকে আঁকতে গিয়ে এইভাবে নিজেকেও এঁকে যান শিল্পীরা।

প্রবাস স্বদেশ ও স্মৃতি

আত্মান্বেষণের দুর্নিবার টানে ঘর ছেড়ে প্রবাসী হলেও শিল্পীরা ভুলতে পারেন না ফেলে আসা স্বদেশের সব স্মৃতি যা আশৈশব জড়িয়ে ছিল মনের আনাচে কানাচে। প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও খ্যাতির ঝলমলে দিনগুলোর মাঝে কখনো কখনো মনে পড়ে যায় স্বদেশের সেইসব কথা। একদা পরিচিত নিসর্গ, লোকজন, পরিবেশ বিস্মৃতির দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়। শিল্পীর সাধ্য কী তাকে উপেক্ষা করেন। তাঁর ক্যানভাসে নতুন করে জেগে ওঠে নস্টালজিয়ায় রঙীন সব স্মৃতিচিত্র।

আবার অবহেলা অনাদরে যখন প্রবাসের দিনগুলো অবসাদময়, তখন এই স্মৃতিচারণ শিল্পীকে যোগায় এক সজীব প্রেরণা, সৃষ্টির নেশায় আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে তুলি। দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ অদর্শন আর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুভব হয়ে ওঠে আবেগময়, রঙের প্রলেপ অনুভূতিপ্রবণ। তাঁর কাছে বেদনা আর আনন্দে মাখামাখি হয়ে থাকা এ অনন্য এক ব্যক্তিগত জগত। অন্যসব কাজের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে ফেলার উপায় নেই। ছবির ইতিহাসে একাধিক বরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবন এমন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

যৌবনের শুরু থেকেই ভিনসেণ্ট ভ্যান গঘ ঘরছাড়া। প্রথমে জীবিকার সন্ধানে, পরে নিজের শিল্পীপরিচয় খুঁজে নেওয়ার তাগিদে। তবে স্বদেশ হল্যাণ্ড ছেড়ে পাকাপাকিভাবে প্রবাসী হলেন প্যারিসে এসে। সেটা ১৮৮৬ সাল। শিল্পীজীবনের মোড় ফেরার সূচনা তখন থেকেই। দু'বছর পর দক্ষিণ ফ্রান্সের আর্লে আসার পর নিজেকে খোঁজার পর্ব শেষ হল। শুরু হল আত্ম-আবিষ্কার, এতদিনের উদ্‌ভ্রান্ত অতীতকে পিছনে ফেলে নতুন পথে দুর্দম বেগে ছুটে চলা। হল্যাণ্ডে থাকতে যা এতদিন এঁকেছেন তার পাশে আর্লের ছবি যেন শিল্পীর নবজন্মের প্রতিভূ হয়ে উঠল।

নিত্য নতুন চিত্রসৃষ্টির এই উন্মাদনার মধ্যেও কিন্তু জন্মভূমিতে ফেলে আসা

জীবনের স্মৃতি ভ্যান গঘকে মাঝে মাঝেই উতলা করেছে। আর্লে আসার কিছুদিন পর, ভাই থিওকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—
—"I keep on thinking Holland and across the two-fold remoteness of distance and time gone by, these memories have a kind of heartbreak in them".

ছবিতেও এসে পড়ে সেই স্মৃতির প্রভাব। তাই নিসর্গচিত্র আঁকতে গিয়ে অজান্তে কখন যে হল্যাণ্ডের প্রকৃতির ছায়া এসে দখল করে নেয় ক্যানভাসের বিস্তৃত পরিসর তা টেরই পান না। পরম বিস্ময়ে তাই বলে ওঠেন—
—"Involuntarily, is it the effect of this Ruysdael country ?" জেকব রুইসডেল সপ্তদশ শতাব্দীর স্বনামধন্য ডাচ নিসর্গচিত্র শিল্পী।

ওই বছরই আগস্টে লেখা চিঠির আরেক জায়গায়—"What I learnt in Paris is leaving me…I am returning to the ideas I had in the country before I knew the impressionists." তাই আর্লে গিয়েও খুঁজে পেয়েছেন স্বদেশের নানা নৈসর্গিক সাদৃশ্য—"Many subjects here are exactly like Holland in character. The only difference is in colour. যেমন নদীতীরে নৌকার সারি, ছোট্ট নদীর ওপর ঝোলানো কাঠের সেতু। এইসব। জীবনের শেষ দিকের একাধিক ছবিতে আবার ফিরে আসে হল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতিচ্ছবি—চালাঘর, গ্রাম্য কুটির, খনি শ্রমিকদের নিচু আস্তানা, ক্ষেতের মাঝখানে কৃষক রমণী। স্বল্পপরিসর জীবনের দীর্ঘ প্রবাস সত্ত্বেও তাঁর কাছে Dutch background-এর মূল্য এতটুকু কমেনি।

পল গগ্যাঁর ক্ষেত্রে এই প্রবাস তো প্রবাস নয়, এক স্বেচ্ছানির্বাসন। যে সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পের রাজধানী প্যারিসে এসে ভীড় করাই রেওয়াজ, তখন গগ্যাঁ প্যারিস ছেড়ে বারবার চলে গিয়েছেন দূর প্রবাসে। শৈশবের দীর্ঘ সাত বছর কেটেছিল পেরুর লিমায়। তার স্মৃতি ভুলতে পারেননি কোনোদিন। সেই থেকেই সম্ভবত গগ্যাঁর প্রবাসী মানসিকতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ঘর ছেড়ে দেশ দেশান্তরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে ঘুরে

বেড়িয়েছেন সারা জীবনই। এই পালিয়ে বেড়ানোর পেছনে বড় তাগিদ, আমরা দেখেছি, তাঁর রোমান্টিক, আদিম শিল্পাদর্শ, বাস্তবে মনের স্বপ্নকে খুঁজে ফেরা। বুঝেছিলেন, প্যারিসের আবহাওয়ায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেখানকার শিল্পী-সমাজ ও শিল্পরসিকদের কাছে এসব পাগলামি, অর্থহীন। স্বদেশের এই উদাসীন প্রত্যাখ্যানে বিক্ষুব্ধ শিল্পীমন বেছে নিল দূর প্রবাসের জীবন। প্রথমে ব্রিটানী, তারপর দু-দুবার তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ। ১৮৯৫ থেকে এই সবুজ দ্বীপই তাঁর দ্বিতীয় পিতৃভূমি, দীর্ঘ সাত বছরের সৃষ্টিভূমি।

তবু মন কিন্তু পড়ে থাকত প্যারিসে। তাঁর পাঠানো ছবি প্যারিসের নবীন শিল্পীবন্ধুরা কিভাবে নেয় তা জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। তার ওপর অপরিসীম দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট, রোগযন্ত্রণায় ভুগে ভুগে শরীর ও মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এইভাবে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে অবসন্ন গগ্যাঁ যখন সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলেন, তখন ঠিক করলেন দেশে ফিরে যাবেন। এক শিল্পী বন্ধুকে লিখে জানালেন সেকথা। সেই প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন গগ্যাঁর জীবনে আর হয়ে ওঠেনি। বন্ধু পরামর্শ দিলেন, দেশে ফেরার কথা যেন না ভাবেন। সুদূর প্রবাসের দীর্ঘস্থায়ী দূরত্ব তাঁকে করে তুলেছে এক প্রবাদ পুরুষ। "You must not come back : you enjoy the immunity of the great dead."

ক্ষতবিক্ষত শিল্পীর ছড়ানো এ প্রবাস জীবনের শেষ দু'বছরের আশ্রয়স্থল হিভা ওয়া দ্বীপ। সেখানে স্বজন বা স্বদেশের কোনো স্মৃতিই খুঁজে পাবার নয়। এই বিশাল সমুদ্রঘেরা অরণ্যময় প্রকৃতির নির্জনে যখন বুঝতে পারলেন শেষের সেদিন আর বেশি দূরে নয়, তখন ষোড়শ শতকের ফরাসী চিত্রকলার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব Chardin ও পল সেজানের চিত্ররীতি অনুসরণে আঁকলেন এক স্টিল লাইফ, Flowers in a Cup (১৯০১)। এ শুধু ছবি নয়, ফেলে আসা জন্মভূমি আর তার অতীত ঐতিহ্যের এক অনবদ্য স্মৃতিচিত্র, স্বদেশের প্রতি প্রবাসী শিল্পীর শেষ শ্রদ্ধার্ঘ। ঐ বছরই আরেকটি স্টিল লাইফ-এ আদিম নিসর্গের স্থানে চিত্রিত করেছেন পুরোপুরি ইউরোপীয় এক দৃশ্য। মৃত্যুর পূর্বে নাড়ীর টান একটিবারের জন্য হলেও মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়।

১৯১০ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে স্বদেশ রাশিয়ার ছোট্ট গ্রাম ভিটেবস্কের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা রূপশিল্পী মার্ক শাগাল। গুণীজনের এই মহামেলায়, তাঁদের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পীমানস। অনুভূতি আর অনুভবের নতুন নতুন জানালা খুলে যেতে থাকে। ক্রমে তৈরী হয় স্বকীয়তার আলোয় উজ্জ্বল সৃষ্টির নতুন এক অবয়ব। ফলে খ্যাতি আর পরিচিতির পরিধি প্রসারিত হতে থাকে। শাগালের স্মৃতির মণিকোঠায় কিন্তু তখনো এতটুকু ফিকে হয়নি ফেলে আসা গ্রামের ছবি, যেখানে বাল্যকাল ও কৈশোরের সব সুখস্মৃতি ছড়ানো। নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, শিল্পী যদি জন্মভূমি ছেড়ে চলেও যান, জন্মভূমির ঘ্রাণ, তার স্মৃতি তাঁর মনে গেঁথে থাকে। প্যারিসের অতিব্যস্ত আধুনিক পরিবেশেও ক্যানভাসে তাই সেই স্বদেশেরই দুর্নিবার হাতছানি। শৈশবের পরিবেশের যে প্রভাব চিরকালের মত জড়িয়ে গেছে মানসিকতায়, তার প্রতিফলন।

প্রবাসে এই স্মৃতিকাতরতায় জন্ম Me and the Village (১৯১১)। এক বৃত্তাকার রচনায় বেঁধে রাখা হয়েছে গ্রামজীবনের টুকরো সব ছবি, রঙীন উপলখণ্ডের মত যা জ্বলজ্বল করেছে শিল্পীর মনে—মেষশাবক, গাভী, দুধ দোয়ানোয় ব্যস্ত স্ত্রীলোক, গ্রামের সার সার ছোট কুঁড়েঘর, কৃষক, ফলন্ত রঙীন গাছ। বর্ণপ্রয়োগে সেসব একান্ত মোহময়, সুখস্মৃতি জাগিয়ে তোলে মনে।

শুধু ওই ছবিতেই নয়, শাগালের অন্যান্য অনেক কাজে অনুভব করা যায় এই স্বদেশী মেজাজের ছোঁয়া। ১৯১১ তে করা The Cattle Merchant-এও স্বগ্রামের নানা রূপকল্পের বিচিত্র সমাবেশ—গরু, ঘোড়া-গাড়িতে চড়া গ্রাম্য বিক্রেতা, গয়লানী, পশু, মানুষজনের প্রতিকৃতি। চলমান ঘোড়ার জঠরে বাচ্চা, গ্রাম্যজীবনের সীমাবদ্ধতার প্রতিভূ। এরপর ১৯১৪ থেকে ১৯২৩ স্বদেশবাস। তারপর আবার ফ্রান্সে দীর্ঘ প্রবাস। Self Portrait with Seven Fingers (১৯১৯) ছবিতে প্যারিসের ইফেল টাওয়ার এসেছে প্রবাসের প্রতীকচিহ্ন হিশেবে। তারই পশ্চাৎপটে কিন্তু রুশদেশের বাড়িঘর, ছবির সামনেও নিজগ্রামের বিভিন্ন জিনিস। মনের দীর্ঘ শিকড় যে রাশিয়ার

মাটিতে তা বেশ বোঝা যায়। এইসব উপলখণ্ডের মত স্মৃতি যেভাবে নানা ভঙ্গীতে শাগালের অন্যান্য ছবির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাতে বোঝা যায় কেন তিনি বলেছিলেন—"I have carried it (my town) forever in my heart,"

পিকাসোর সুদীর্ঘ শিল্পী জীবনের বলতে গেলে সবটাই প্রবাসে কেটেছে। ১৯০০ সালে জন্মভূমি স্পেন ছেড়ে প্রথম যখন প্যারিসে আসেন তখন তাঁর বয়স মোটে উনিশ। তারপর জন্মভূমি আর প্যারিস করতে করতে পাকাপাকিভাবে প্রবাসী হলেন ১৯০৪ সালে। তখন থেকেই প্যারিস তথা ফ্রান্সই আমৃত্যু পিকাসোর বাসভূমি, যুগান্তকারী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রভূমি। কিন্তু মাতৃভূমির স্মৃতি তা ম্লান করে দিতে পারেনি। তাই গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনে অগণিত মৃত্যু আর ধ্বংসলীলায় আবেগমথিত হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পীমন। জন্ম দেয় অবিস্মরণীয় গের্ণিকা সিরিজের চিত্রাবলীর, যার মধ্যমণি গের্ণিকা ছবিটি। স্বদেশভূমির লাঞ্ছনায় প্রবাসী শিল্পীর ক্ষোভ, বেদনা, ক্রোধের অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে আছে সেসব কাজে।

সেই স্পেন যখন ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো কবলিত হয়ে রইল, দেশে ফেরার উপায় রইল না, তখন এই প্রবাসকে তাঁর মনে হল নির্বাসন—"I have always been an exile." ফ্রাঁসোয়া জিলো Life with Picasso গ্রন্থে বলেছেন—"প্রায়ই পাবলো আমাকে ওর ফেলে আসা দিনগুলো সম্পর্কে বলতো। আর সেই কথাবার্তায় প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে ছড়ানো ছিটানো থাকত ওর ফেলে আসা দেশের প্রতি তীব্র আকুলতা।" এটা চল্লিশের দশকের শেষ ভাগের কথা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে বহু ছবিতে স্পেনীয় মেজাজের প্রতীক ষাঁড় আর তার করোটির ক্রমান্বয় উপস্থিতি এই আকুলতার রক্তাক্ত চিত্রায়ন।

মৃত্যুর ছায়াঘন শিল্প

শিল্পের জগতে এক আশ্চর্য বৈপরীত্য আছে। জগত ও জীবনের সঙ্গে যাঁদের রঙ তুলির পরম ঘনিষ্ঠতা, তাঁরাই আবার মৃত্যুর প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ অনুভব করেন। জীবনবোধের পাশাপাশি মৃত্যুচেতনা যুগিয়ে যায় ছবির বিচিত্র রসদ। জীবনের মত মৃত্যুকেও চিরে চিরে চিনে নেওয়ার ইচ্ছায় চালিত হয় তুলি। এইভাবে গড়ে উঠেছে চিত্রকলার এক বড় অংশ, মৃত্যুর ছায়াঘন অনবদ্য চিত্রসম্ভার।

উনিশ শতকের প্রথম দিককার ফরাসী শিল্পী জেরিকোর কথাই প্রথমে। ওঁর ক্যানভাস ছিল জীবনীশক্তিতে উচ্ছল। তেজী, স্বল্পায়ু এই শিল্পী ক্রমান্বয়ে এঁকে গিয়েছিলেন গতির প্রতীক ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি, রেসকোর্সে ঘোড়দৌড়, একের অপরকে ছাড়িয়ে যাবার ঊর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা। এই গতিরই তো অপর নাম জীবন, বেঁচে থাকা। তবু অদ্ভুত এক মৃত্যুচেতনা মিশে ছিল তাঁর শিল্পীমনের গভীরে। মৃত মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর মুখের প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করতেন। গভীর মনযোগে তা লক্ষ্য করে গেছেন দীর্ঘসময় ধরে। Heads of Executed Men (১৮২০) ছবিতে এই পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে মৃত্যুবোধ মিশে গেছে। নিহত একটি নারী ও একটি পুরুষ পাশাপাশি শায়িত, মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত, বীভৎস। এক অস্বস্তিকর আবহ এখানে সৃষ্টি হয়েছে। ১৮১৯-এ করলেন তাঁর অন্যতম সেরা শিল্পকীর্তি Raft of the Medusa. বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ডুবন্ত এক ভাঙ্গা নৌকায় মৃত্যুর মুখোমুখি একদল মানুষ, চোখেমুখে তাদের ভয়ার্ত ভঙ্গী। শিল্পী নিজের চেতনা দিয়ে, গভীর অনুভব দিয়ে ফুটিয়েছেন। তাই তা ভয়ঙ্কর, তবু আবেগময়।

১৮৮৫তে নুনেন অঞ্চলে কৃষকদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চিত্রসৃষ্টিতে মগ্ন থাকার সময় মৃত্যুভাবনা ঘিরে ধরেছিল ভ্যান গখের শিল্পীবোধ। তখনকার

এক ছবি সম্বন্ধে লিখেছেন—"I wanted to express how those ruins show that for ages the peasants have been laid to rest in the very fields which they dug up when alive. I wanted to say what a simple thing death and burial is, just as simple as the falling of an autumn leaf—just a bit of earth dug up—a wooden cross."

সুতরাং মৃত্যু তাঁর কাছে জীবন থেকে আলাদা নয়। আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে তা পিঠোপিঠি জড়ানো, নিতান্ত স্বাভাবিক। ফলে একই ক্যানভাসের মধ্যে দুই-এর প্রতীকই পাশাপাশি বিরাজ করছে। বিখ্যাত Sunflower চিত্রগুচ্ছকে বলা হয় অস্তিত্বের বর্ণময় ছবি, যা জগতের উৎস সূর্যের মতই মহিমান্বিত। কিন্তু একগুচ্ছ সদ্যফোটা ও পূর্ণবিকশিত ফুলের মাঝে শুকিয়ে যাওয়া ফুলও রয়েছে। ঠিক যেন জীবনের শুরু আর শেষের মত একত্রে তাদের সহাবস্থান। তাই আর্লেতে প্রকৃতিকে নতুন ক'রে জানার নেশায় যখন কর্মোন্মাদ, মানুষ ও শিল্পী বলে বেঁচে থাকার এক আলাদা অর্থ খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক তখনই মৃত্যুর চিন্তায় উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। ভাইকে জানালেন, চিত্রকরের জীবনে মৃত্যু নিদারুণ কোনো ব্যাপার নয়। আকাশের তারাদের পানে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখেন, মনে মনে ভাবেন, রোগ আর মৃত্যুতেই তাদের কাছে পৌঁছনো যায়। আর পরিণত বয়সের শান্ত মৃত্যু মানে ওখানে পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া।

এই মৃত্যুভাবনার মূলে ওই সময়কার নিদারুণ একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা। তাই মরণকে আলিঙ্গন করে তারাদের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন, ঘোচাতে চেয়েছেন এই দূরত্ব। কিছুদিনের মধ্যেই তা প্রকাশ পেল অনবদ্য Cafe Terrace at Night ছবিতে। রাতের আকাশে সেখানে উজ্জ্বল ছোট বড় তারার মেলা, নীচে কাফের টেবিলে শুধুই শূন্যতা। ওপরের চিঠি জুলাই ১৮৮৮তে লেখা। পরের মাসে কাকার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা আরেক চিঠিতেও মৃত্যু নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা।

পরবর্তীকালে সেণ্ট রেমীতে আঁকলেন the Reaper, নিজের কথায় "that image of death as the great book of Nature repre-

sents it to us." শেষে এই মৃত্যু যখন সৃষ্টির পরিসর ছেড়ে স্বয়ং স্রষ্টাকেও গ্রাস করতে এল, তার আগমন বার্তার ঘোষণা শোনা গেল অন্তিম ছুটি ছবিতে। সেখানে তাই কালো আকাশে ঝড়ের পাখিদের ত্রস্ত ওড়াউড়ি। ভ্যান গঘের মৃত্যুচেতনার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি এখানে আঁকা। নিজেকে শেষ করেই তার শেষ। জীবনের মূল প্রতীক যে রৌদ্রোজ্জ্বল শস্যক্ষেত, সেই সৃষ্টিপ্রাচুর্যের মধ্যে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তাঁর শেষ ক'টি কথা—I wish I could die now.

মৃত্যুর চিন্তায় গগ্যাঁর শিল্পীমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাহিতি পর্বের শেষ ভাগে। তার আগে ওখানে প্রথম থাকার সময়ও মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তাঁর ক্যানভাসে, নাম The Spirit of the Dead keeps Watch (১৮৯২)। অন্ধকার ঘরে একটি বিবসনা তাহিতি মেয়ে বিছানায় শোয়া, ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত। মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না, পাছে অশরীরী আত্মাদের মুখোমুখি হতে হয়। মেয়েটির শয্যাপ্রান্তে এক কালো মূর্তি। এদিক ওদিক কয়েকটি উজ্জ্বল আলোর ছটা। পরিবেশ জুড়ে এক গা ছমছম ভাব।

তবে নিজের জীবনে মৃত্যুভাবনার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত লক্ষ্য করা গেল ১৮৯৫ থেকে। নিঃস্ব নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরিয়া হয়ে প্যারিস ছেড়ে দ্বিতীয়বার যখন তাহিতি পাড়ি দিলেন, তখন মরণের সাহচর্যের কথাই প্রথম মনে পড়ে গগ্যাঁর। এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালেন—"There is nothing left for me but to dig my grave out there, amongst the silence and the flowers." ওখানকার ক্রমাগত দুঃখকষ্ট আর রোগযন্ত্রণায় এই চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। তার ওপর আসে মানসিক আঘাত—অতিপ্রিয় ছোট মেয়ের মৃত্যুসংবাদ। এইসঙ্গে ছিঁড়ে গেল সংসারের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে শেষ বন্ধনটুকু। ১৮৯৭ সালে বন্ধুকে লিখলেন—"I want only silence, silence and more silence. I want to be left to die in peace, forgotten.

এই সংকটে তাঁর মনে হয়েছিল মৃত্যুই বোধ হয় এনে দিতে পারে মুক্তি—"I can only think of death which frees us from all suffer-

ing". মানসিক বৈকল্য ক্রমে এমন স্তরে পৌঁছোয় যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করতে গেলেন সে বছর। আত্মহত্যার এই চেষ্টা, সৌভাগ্য আমাদের, সফল হয়নি। ওই ১৮৯৭ সালেই করলেন অন্যতম সেরা তৈলচিত্র Nevermore. তাতে বিবসনা এক তাহিতি নারীর শয্যার পেছনে মৃত্যুর দূত এক কালো পাখি অপেক্ষমাণ। মৃত্যুর ছায়া ক্রমাগত শিল্পীকে তাড়া করে ফিরছে বেশ বোঝা যায়।

পিকাসোর জীবনীকার রোল্যাণ্ড পেনরোজ লিখেছেন, যে কয়েকটি বিষয় (theme) **পিকাসোর** ছবিতে ক্রমান্বয়ে ঘুরে ফিরে এসেছে তার অন্যতম মৃত্যু, "the haunting presence of death." দীর্ঘজীবনে এর প্রভাব কখনো এড়াতে পারেননি। শিল্পীজীবনের একেবারে গোড়ায়, 'নীল পর্বে' তার সূচনা। ওই সময় তিনি দরিদ্র, ভবঘুরে, ক্ষুধার্ত মানুষদের আঁকছেন, তাদের দুঃখ -বেদনা ছবির কানায় কানায় মাখামাখি। এর সঙ্গে মৃত্যুবোধ খুব মিলে গিয়েছিল। তাঁর এক শিল্পীবন্ধু কাসাগেমা ১৯০১ সালে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। এ খবর শোনামাত্র তার মা মারা যান। এই শোচনীয় ঘটনা তরুণ পিকাসোকে বেশ কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রাখে, haunt করে। The Burial of Casagemas ছবিতে সেকথা বিবৃত হয়েছে ঘন নীল বিষণ্ণতায়। শোকার্ত আত্মীয়স্বজন যখন সমাধিস্থলে শেষকৃত্যের জন্য সমবেত, কফিনে মৃতদেহ সমাধিস্থ হবার অপেক্ষায়, তার আত্মা তখন উঠে যাচ্ছে উর্ধ্বলোকে, মিলিত হচ্ছে অন্যদের সঙ্গে। কফিনে মৃত কাসাগেমাকে দেখিয়ে আরো কয়েকটি ছবি ওই সঙ্গে করেছিলেন, যেমন The Dead Man. দু'বছর পর La Vie তেও এই বেদনার ছায়াপাত। প্রেমিকার পাশে দাঁড়ানো এক যুবকের মুখ প্রথমে ছিল পিকাসোর আত্মচিত্র। কিন্তু পরে নিজের মুখ মুছে দিয়ে সেখানে প্রয়াত বন্ধুর মুখ এঁকে দেন।

এরপর করলেন The Death of Harlequin (১৯০৬)। দেখা গেল মৃত্যুর এক অসামান্য শিল্পসম্মত রূপ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত Harlequin (সার্কাসের ভাঁড়), হাত দুটি প্রার্থনার ভঙ্গীতে জড়ো করা, চোখেমুখে প্রশান্তি। তার রঙ-বেরঙের পোষাক থেকে একে একে রঙ অন্তর্হিত হয়ে বাষ্পে পরিণত

হচ্ছে, মাত্র একটি কি দুটি রঙ তখনো অবশিষ্ট। মৃত্যুর বর্ণহীন শুভ্রতায় বিলীন হতে চলেছে সে দেহ। মৃত্যুর তো কোনো রঙ নেই। জীবনের সব রঙের পরিণতি ওই শ্বেতশুভ্রতায়। মরণের এত দ্যোতনাময় ছবি শিল্পের ইতিহাসে দুর্লভ।

প্রিয়জন বা প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু পিকাসোর ছবিকে কিভাবে প্রভাবিত করত, তার আরো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন Three Dancers (১৯২৫)। এখানে পিকাসোর তথা আধুনিক ছবির এক নতুন পর্বের সূচনা, আর এতদিনকার সাজানো গোছানো মনোহর নিওক্লাসিকাল স্টাইলের শেষ। এক পুরনো বন্ধুর মৃত্যুতে তখন পিকাসো কাতর, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মনে হল এতদিনের বিশ্বাস, নির্ভর ভেঙ্গে গেল। ছবিতে দেখা গেল সেই ভাঙচুর। তিনটি নৃত্যরত নারীমূর্তি বিকৃত, বীভৎস উদ্দাম। সেই প্রথম নারীদেহের এলোমেলো হওয়ার শুরু। ছবির পশ্চাৎপটে মৃত বন্ধুর মুখের ছায়া, দেওয়ালে প্রতিফলিত। কি পরিপ্রেক্ষিতে এ ছবি আঁকা তা এখানে বুঝিয়েছেন এইভাবে। স্বভাবতই Three Dancers নামকরণ তাঁর পছন্দ হয়নি। এ নাচ তো আনন্দের নয়, শোকবিহ্বলতার।

যাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা দিয়ে শিল্পীজীবনের সূচনা, সেই দীর্ঘদিনের প্রিয় কবি বন্ধু ম্যাক্স জ্যাকব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় অত্যাচারে প্রাণ হারান। একাধিক বন্ধুস্থানীয় শিল্পী ও কবির একই হাল হয়। স্তম্ভিত বেদনাবোধ নিয়ে পিকাসো শুরু করলেন The Charnel House (১৯৪৪-৪৫)। অসমাপ্ত এই ছবিটির রেখার প্রতি টানে জড়িয়ে আছে মৃত্যুযন্ত্রণা, গের্নিকাসদৃশ অভিব্যক্তি। একটি টেবিলের নীচে দেখা গেল স্তূপীকৃত মৃতদেহ, নাৎসীদের হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্ররূপ। ১৯৫৫ সালে বন্ধু শিল্পী মাতিসের মৃত্যুর পরও পিকাসোর তুলি আবেগে রঙীন হয়ে ওঠে। মাতিসের প্রিয় বিষয় ওডালিস্ক অবলম্বনে তাঁর প্রিয় রঙ বেগুনি, নীল, লাল দিয়ে আঁকা হল Woman in Turkish Costume সিরিজের ন'টি প্রতিকৃতি। এ যেন মাতিসের এক pictorial obituary, মৃত্যুর পর আরেক শিল্পীর শোকশ্রদ্ধার্ঘ্য।

পিকাসোর শিল্পের রসদ শুধু ব্যক্তিমৃত্যু নয়, গণমৃত্যুও। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হত্যালীলায় জন্ম গের্ণিকার, কোরিয়ায় The Massacre of Korea. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞে বিচলিত পিকাসোকে দেখা গেছে আঁকছেন রক্তাক্ত ষাঁড়ের মাথার খুলি, মৃত্যুর অব্যর্থ প্রতীকী চিত্ররূপ। তবে জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিকাসোর মনে নিজের মৃত্যুচিন্তাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। তাই তড়িঘড়ি কাজ শেষ করেছেন, যাতে যা বলার তার সবটুকু প্রকাশ করে যেতে পারেন।

মৃত্যুর বেদনা থেকে জন্ম অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম সেরা চিত্রকীর্তি 'শাজাহানের মৃত্যু প্রতীক্ষা।' আগ্রা দুর্গের বারান্দায় খাটে শায়িত শাজাহান অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায়, চোখ দূরে আবছা চাঁদের আলোয় রহস্যময় তাজমহলের দিকে। নিজের অতি আদরের ছোট মেয়ে প্লেগে মারা যাবার পর শিল্পী ব্যক্তিগত শোকের নিবিড় উপলব্ধি ওই ছবিতে মিলিয়ে দিয়েছেন সম্রাটের মৃত্যুতে। এক হিশেবে তা যেমন শোকের প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি সেই শোক জুড়োনোও বটে। "এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম।" (আত্মকথা)। পরে কবি জসিম উদ্দিনের কাছেও বলেছেন একই কথা— "আমার মেয়ের মৃত্যুজনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে রঙীন হয়ে উঠল। আঁকতে আঁকতে মনে হল, সম্রাটের চোখে মুখে আর পেছনের দেয়ালের গায়ে আমার সেই দুঃসহ শোক যেন আমি রঙীন তুলিতে করে দিচ্ছি। ছবির পিছনের মর্মর দেয়াল আমার কাছে জীবন্ত বলে মনে হল। যেন একটা আঘাত করলেই তা থেকে রক্ত বের হবে।"

জীবনের ওপারের জগত সম্পর্কে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল অপার জিজ্ঞাসা। সৃষ্টির বিশটি বছর ধরে তাঁর কৌতুহলী শিল্পীমন সে উত্তর খুঁজে ফিরেছে। আত্মার বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিভিন্ন সময় গড়ে তুলেছেন শাদাকালো ছবির এক বিচিত্র সম্ভার। নিঃসীম কালো আকাশে আত্মার শুভ্র অবয়বের দ্রুত চলাচল যেমন ধরেছেন সীমিত পরিসরে, তেমনি কবরে তার নিশ্চল মূর্তিও চিত্রায়িত অসামান্য দক্ষতায়। এইভাবে পরপর এসেছে মৃত্যুর নানা রূপকল্প।

তবে মৃত্যুর পর শিল্পীর ওপারে চলে যাওয়ার ছবিতে গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে। শাদায় শাদায় ঢাকা শিল্পীর দেহ প্রায় অদৃশ্য, সামনে অনন্ত জগতের বিরাট খোলা দরজার হাতছানি। এ আকর্ষণ যে গগনেন্দ্রনাথের নিজেরই তা গভীর ব্যঞ্জনায় আভাষিত।

যীশুর মৃত্যু নিয়ে অজস্র ছবি আঁকা হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে। সেখানে যে শুধু ধর্মীয় ভাবই প্রধান তা নয়। মৃত্যু সম্পর্কিত শিল্পীদের নিজস্ব ধারণারও তাতে প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন যুগে। একেকজনের তুলিতে তাই একই মৃত্যুর নানাবিধ চেহারা—কখনো বীভৎস, কখনো বেদনাময়, কখনো পরম রমণীয়, কখনো বা এক স্বাভাবিক ঘটনামাত্র, এমনকি নাটকীয়তায় ভরাও। চিত্রকরের দেখাটাই এখানে বড় কথা, সৃষ্টির আসল চাবিকাঠি।

চিত্রশিল্পে রিমেক

চলচ্চিত্রে রিমেক কথাটি সুপরিচিত। অতীতের নানা বিখ্যাত ছবি পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রকারদের হাতে নতুন সৃষ্টির মর্যাদা পায়। চিত্রশিল্পেও এই রিমেক-এর দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। প্রিয় শিল্পীর চিত্রকর্ম আলাদাভাবে নিজের মত করে গড়ে তোলার তাগিদ চিত্রকররা অনেকদিন থেকেই অনুভব করে আসছেন। চেতনার গভীরে নাড়া দিয়ে গেছে যেসব কাজ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের নতুন এক তাৎপর্য খুঁজে পান তাঁরা। অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার আলোয় অন্যভাবে দেখে নিতে চান কখনো অতীতকে, কখনো বা সমকালকে। শুধু অন্যের নয়, নিজের পূর্ববর্তী কাজও এই ভাঙ্গাগড়ায় নতুন অবয়ব ধারণ করে। ছবির ইতিহাসে নবনির্মাণের এ এক বিস্ময়কর অধ্যায়। এখানে আমরা বেছে নেব এমন ক'জন মহাশিল্পীকে যাঁদের হাতে এই ধরনের চিত্রকর্ম নতুন মাত্রা পেয়েছে।

প্রথমজন **পিকাসো**। নিজের শিল্পীমানসে রূপ ও রসের এত বিচিত্র সঞ্চয় ছিল যে একই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপস্থাপনায় ক্যানভাস ঝলমল করে উঠেছে। প্রতিটি বিষয়ের সম্ভাব্য সবরকম রকমফের রঙ ও রেখায় ফুটিয়ে তুলতে না পারলে যেন তাঁর শান্তি নেই। পূর্বসূরিদের শিল্পকর্মও একইভাবে স্বকীয় মেজাজে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়, "অতীতের অনেক বড় কাজ আমি প্রায়ই ফিরে ফিরে করেছি। একই সময় আমি নানা রীতিতে কাজ করি।" চিত্রশিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর সচেতনতা না থাকলে পিকাসোর পক্ষে এটা সম্ভব হত না। চিরনতুন হলেও তাঁর ছবি আসলে শিল্পের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের মূলে প্রোথিত। এজন্যই তাঁর মনে হয়েছিল, অতীত ও বর্তমানের বিখ্যাত সব শিল্পীরা পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাজ করতে

দেখছেন। মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পীদের জগদ্বিখ্যাত ছবির নতুনতর ফর্ম, আধুনিকতম বিন্যাস খুঁজে ফেরা পিকাসোর ক্ষেত্রে তাই অর্থবহ, অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। শুধু সংখ্যার বিশালতায় নয়, উপস্থাপনার বৈচিত্র্যেও।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকাসো উনিশ শতকের ফরাসী চিত্রকর **ইউজিন দেলাক্রোয়ার** বিশ্ববন্দিত Women of Algiers (১৮৩৪) অবলম্বনে ১৫টি ছবির এক সিরিজ আঁকা শুরু করেন। দেলাক্রোয়ার ছবিতে তিনজন রমণী বিভিন্ন ভঙ্গীতে পাশাপাশি বসে, পরনে কারুকার্যময় জমকালো পোষাক। ঘরের প্রায়ান্ধকার পশ্চাৎপটে উজ্জ্বল আলো পড়ায় তা আরো মনোরম। পিকাসোর নবসংস্করণে নারীমূর্তিগুলো ও পশ্চাৎপট নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে বড় জ্যামিতিক আকারে ভেঙ্গে নেওয়া হল। তারপর শিল্পী সেগুলোকে এক জটিল কিন্তু অত্যন্ত বর্ণময় এবং আকর্ষণীয় চিত্ররূপে সাজালেন। তিনবছর পর ১৯৫৭ সালে ষোড়শ শতকের স্পেনীয় শিল্পী **ভেলাসকুজের** অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম Las Meninas (১৬৫৬) অবলম্বনে ২০টি ছবির নতুন একটি সিরিজের কাজে হাত দিলেন। এখানেও তিনি মূল ছবিটি নিজস্ব ভঙ্গীতে বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত করলেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিকাসো ব্যাপৃত রইলেন ২৫টি তৈলচিত্র ও অজস্র ড্রয়িং-এ। এবারের বিষয়বস্তু উনিশ শতকের ফরাসী শিল্পী **এডুয়ার্ড মানের** আলোড়ন সৃষ্টিকারী তৈলচিত্র Luncheon on the Grass (১৮৬৬)। এই সমস্ত ছবিতে পিকাসো তাঁর মূল উৎসগুলিকে পছন্দমত অদলবদল করে নিয়েছেন। তাদের কখনো সরলীকরণ করেছেন, কখনো বা একত্রে মিশিয়েছেন। অনেকটা সঙ্গীত রচনার মত। এখানে রঙের সমন্বয় সুরের ঐকতানকেই মনে করিয়ে দেয়।

তবে পুনর্নির্মাণ হিশেবে পিকাসোর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ The Rape of the Sabines (১৯৬১)। বিষয়বস্তুটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস রোমের অধিবাসীদের জন্য স্ত্রী যোগাড় করে দেবার উদ্দেশ্যে একবার প্রতিবেশী স্যাবাইনদের একটি উৎসবে আমন্ত্রণ জানান। তারপর যথাসময়ে তাঁর নির্দেশ পাওয়ামাত্র রোমানরা স্যাবাইন

রমণীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ষোড়শ শতকের ফ্লেমীয় শিল্পী রুবেন্স থেকে শুরু করে সেই শতকের ফরাসী চিত্রকর পুসাঁ ও উনিশ শতকের দাভিদ এই ঘটনার তাৎপর্য তাঁদের সময়কার পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। পিকাসোতে এই পরম্পরা চূড়ান্ত রূপ পেল। দুর্বল ও অসহায়ের ওপর সবলের অত্যাচারে শিল্পী বরাবরই বিচলিত, বেদনার্ত। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধে অসহায় নিরীহ মানুষের নির্বিচার হত্যা তাঁর বহু স্মরণীয় ছবির উৎস। গণহত্যার দিন শেষ হয়ে যায়নি আজো। এই উপলব্ধি নতুন করে প্রকাশ করতে গিয়ে পিকাসো এবার বেছে নিলেন পুসাঁর মাস্টারপিসটি। ঐ ছবির মানুষজন ও প্রেক্ষাপট নিজের পরিকল্পনামত সাজালেন। সেই সঙ্গে চিত্রায়িত করলেন শিশুসন্তানের মৃতদেহ নিয়ে বিলাপরত মাতার শোকাকুল মূর্তি। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গের্ণিকা ছবিটির একাংশের পুনরাবৃত্তি এটি। পুরনো অতীতের এই নবনির্মাণের মধ্য দিয়ে শিল্পী ফিরে এলেন তাঁর অতীত জীবনের দিনগুলিতে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গের্ণিকা ছবি রচনার পুরনো প্রতিবাদী মেজাজে।

সমকালীন ও অতীতের বিখ্যাত শিল্পীদের বিভিন্ন কাজ 'অনুবাদ' করার এক সহজাত প্রবণতা ভ্যান গঘের ছিল। ভাই থিওকে লেখা চিঠিপত্রের পাতা ওল্টালেই শিল্পীমনের এই তাগিদের কথা জানা যাবে। উনিশ শতকের ফরাসী চিত্রকর মিলে তাঁর প্রিয় শিল্পীদের অন্যতম। শিল্পীজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিলে-র বেশ কিছু ছবির নানা রূপান্তর চিত্রায়িত করেছেন। তার মধ্যে বীজবপনরত চাষীকে নিয়ে আঁকা বিখ্যাত The Sower ছবিটিই একাধিকবার। সেখানে প্রায়ই ভ্যান গঘের মৌলিক ভাবনা বড় হয়ে উঠেছে। যেমন ১৮৮৮ সালে আর্লেতে করা ছবিটি। শিল্পীর পরিণত চিত্ররীতিতে তা এক আলাদা সৃষ্টি, অবিমিশ্র রঙের গৌরবে উজ্জ্বল। মিলেতে সেখানে সামাজিক ও ধর্মীয় বক্তব্যই প্রধান।

তবে ভ্যান গঘের শিল্পীমনে এক মহার্ঘ সম্পদের মত ছিল রেমব্রান্টের ছবির সম্ভার। স্বভাবতই চিঠিপত্রে তাঁর সম্পর্কে নানা উল্লেখ, নানা পরিকল্পনা। যেমন, "রেমব্রান্ট থেকে কিছু কাজ করার চেষ্টা করব। বিশেষ করে

Man at Prayer ছবিটি আবার করার ইচ্ছা আছে। হাল্কা হলুদ থেকে বেগুনি পর্যন্ত সবরকম রঙই এতে ব্যবহার করব।" শেষে সেন্ট রেমীতে বেছে নিলেন রেমব্রান্টের দুটি বিখ্যাত চিত্র—Resurrection of Lazarus ও Good Samaritan. বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে করা প্রথম ছবিটি রেমব্রান্টের গভীর ধর্মভাবনার ফসল। তাই যীশুর সর্বাঙ্গ থেকে নির্গত এক স্বর্গীয় আভায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের একাংশ আলোকিত। ভ্যান গঘের অনুবাদে আলোর উৎস যীশু নন, প্রকাণ্ড সূর্য। তাঁর ছবি যতটা না ধর্মীয় তার চেয়েও রৌদ্রালোকিত এক নিসর্গচিত্র। রেমব্রান্টে আলো আঁধারির খেলা, ভ্যান গঘে উজ্জ্বল রঙ আর আলোর সমাহার। মেজাজের ফারাকটা লক্ষণীয়। এছাড়াও করলেন **দেলাক্রোয়ার** ধর্মীয় ছবি পিয়েতা। দেলাক্রোয়ার রঙ সম্পর্কিত ধারণা আর রঙের ব্যবহার তাঁকে সর্বদাই ভাবিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে। পিয়েতার চিত্রানুবাদ সেই ভাবনাচিন্তার খানিক প্রকাশে রঙীন।

জাপানী ছবির প্রতি ভ্যান গঘের আকর্ষণ শিল্পীজীবনের গোড়া থেকেই। বহুদিন ধরে এসব ছবির প্রিন্ট পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনে তাঁর শিল্পীমানস পরিণত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে প্যারিসে এসে ১৮৮৭ সালে উনিশ শতকের এক সেরা জাপানী চিত্রকর **হিরোশিগের** একটি বিখ্যাত ছবি The Bridge in the Rain তেলরঙে করলেন। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে নদীর ওপর কাঠের সেতু দিয়ে কয়েকটি মানুষ দ্রুত গমনাগমনে ব্যস্ত, মাথায় বেতের টুপি। জাপানী ছবি সম্পর্কে এতদিনের ধারণা, এতদিনের মুগ্ধতা উজাড় করে দিলেন হলুদ, সবুজ আর হালকা নীল রঙের বৈচিত্র্যে। সেজন্য বিষয়বস্তু হুবহু এক থাকলেও তা কখনই হিরোশিগের রেখাপ্রধান, সীমিতবর্ণের চিত্রটির পুনরাবৃত্তি নয়, পুনর্নির্মাণ।

শিল্পী যখন নিজের কোনো কাজকে পরবর্তীকালে নতুন করে গড়ে তোলেন, তখন তার এক আলাদা তাৎপর্য থাকে। তাতে বোঝা যায়, পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিল্পীপ্রতিভা কীভাবে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলে। সেই বিচারে **রেমব্রান্টের** Return of the Prodigal Son সার্থক রিমেক-এর এক অবিস্মরণীয় দলিল। প্রাচীন এই গল্পটিতে পিতা-

পুত্রের পুনর্মিলনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পিতাকে ত্যাগ করে পুত্র বেরিয়েছিল সুখের সন্ধানে। কিন্তু বহুবছরের ছন্নছাড়া জীবনযাপনের পর সর্বস্বান্ত হয়ে অসুস্থ শরীরে সে অবশেষে পিতার আশ্রয়ে ফিরে আসে। কাহিনীর মানবিক আবেদন যৌবনেই রেমব্রাণ্টকে আকর্ষণ করে। ১৬৩৬ সালে এ নিয়ে একটি এচিং করলেন। তাতে পিতাপুত্রের বিভিন্ন ভঙ্গীর অভিব্যক্তি জীবন্ত রূপ পেল। পিতাকে আঁকড়ে ধরার জন্য পুত্র সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আবেগে খসে পড়েছে তার পরনের বস্ত্র। কিন্তু বত্রিশ বছর পর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রেমব্রাণ্ট ছবিটি যখন তেলরঙে নতুন করে করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বক্তব্যের গভীরতা বোঝাতে কোনো বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বা গতির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হল না। শুধুমাত্র ঘন কালো পশ্চাৎপটে উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে ফুটিয়ে তুললেন নিশ্চল নিঃশব্দ এক মানবিক নাটকের নির্যাসটুকু। তীক্ষ্ণ আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল বৃদ্ধ অন্ধ পিতার আবেগতৃপ্ত ক্ষমাসুন্দর মুখমণ্ডল, পরমস্নেহে পুত্রের পিঠের ওপর রাখা দুখানি হাত, হাঁটু মুড়ে পিতার কোলে মুখ গুঁজে থাকা পুত্রের কেশহীন মাথা, ছেঁড়া জুতো আর পোষাক। একাধারে তার দুঃখদুর্দশা আর অসহায় আত্মসমর্পণের এ এক অসামান্য ছবি। অনেকদিন পর, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে, পিতা ফিরে পেলেন হারানো পুত্রকে; পুত্র ফিরে পেল হারানো বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল। মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায় না—মানবজীবনের এই চিরসত্যের এমন মর্মস্পর্শী প্রকাশ ছবির ইতিহাসে দুর্লভ।

মাতিসের বিশ্ববন্দিত Harmony in Red-এর জন্ম ক্রমাগত পুনর্জন্মের এক কাহিনী। ১৯০৮ সালে রুশ সংগ্রাহক শুকিন-এর জন্য প্রথম যখন ছবিটি আঁকেন তখন তার নাম ছিল Harmony in Green. একটি মেয়ে খাবার সাজানোয় ব্যস্ত, চারপাশে লতানে শাখার নানা সারি। সবুজের সমাহার সারা ক্যানভাস জুড়ে। কিছুদিন পর তা মনমত না হওয়ায় নতুন করে ছবির রঙ পাল্টে নীল করে দিলেন। শুকিনকে বিক্রিও করা হয়ে গেল। কিন্তু মস্কোগামী জাহাজে পাঠাবার আগে মাতিসের মনে আবার দেখা দিল অসন্তোষ। এবার মনে হল নীল রঙের সামঞ্জস্যও ঠিকমত হয়নি। ফলে শেষ মুহূর্তে রঙ

মুছে দিয়ে ছবিটি আবার নতুন করে আঁকলেন। এইবার টেবিল ও দেওয়াল লাল রঙে একাকার করে দিলেন। এর ফলে লতানে গাছগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল, কিন্তু গাঢ় লালের প্রাচুর্যের জন্য তা খেলো হল না। একবছর ধরে একাধিক রিমেকের পর শিল্পীর কাঙ্ক্ষিত সঠিক চিত্ররূপ অবশেষে ধরা দিল ক্যানভাসে।

ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে এইভাবেই শিল্পীরা সার্থকতার সন্ধান পেয়ে যান। এ যেন প্রতিক্ষেত্রেই নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা, ক্রমাগত সংশোধন করে এগিয়ে যাওয়া মহত্তর উপলব্ধির দিকে। তাই পুরনো শিল্পীপরিচয়কে ছবিতে বারবার মুছে ফেলে **রবীন্দ্রনাথ** উপস্থিত করেছেন সৃষ্টির নতুন সব শিল্পরূপ। বেশ কিছু ছবি এভাবে নতুন করে এঁকে গেছেন। রানী চন্দকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—"আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে 'বেশ সুন্দর হয়েছে' তখন আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি করে তার আর একটা রূপ বের হয়।" (আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ)। একই কথার কী আশ্চর্য প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালে পিকাসোর লেখাতেও—"নিজের ছবিটা নষ্ট করতে হয় এবং বার বার নষ্ট করতে হয়। একটা খুব সুন্দর সৃষ্টিও যখন শিল্পী ধ্বংস করেন তখন আসলে সেটা নষ্ট হয় না, বদলে যায়, সংক্ষিপ্ত হয়, সংহত হয়। সম্পূর্ণ কাজটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, একে একে খারিজ করার ফল।" এই হিশেবে মহৎ শিল্পকর্মের এক বড় অংশই রিমেক।

এই সংঘাত, এই সখ্যতা

একদিকে রেষারেষি ও সংঘাত, অন্যদিকে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা—চিত্রকলার দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধি বিপরীতমুখী এই দুই পথে। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার দ্বৈত অভিজ্ঞতায় আত্মস্থ শিল্পীদের ক্যানভাসে খুলে গেছে ছবির নতুন দিগন্ত, সৃষ্টি হয়েছে প্রবাহমানতার রঙীন ইতিহাস।

আর পাঁচটা শিল্পের মত ছবির জগতেও পেশাদারী রেষারেষির দৃষ্টান্ত অনেকদিনের। **মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো** আর **লিওনার্দো দা ভিঞ্চির** মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতার কথাই প্রথমে বলার মত। ভাসারি বলেছেন—"Leonardo and Michelangelo strongly disliked each other." এর প্রধান কারণ অবশ্যই পেশাগত। নিজের ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার আর কোনো শিল্পীর সমাদর তাঁর কাছে অসহ্য। ১৫০০ সালে মিলান থেকে ফ্লোরেন্সে যখন ফিরে এলেন, লিওনার্দোর শিল্পীখ্যাতি ও সম্মান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। লিওনার্দোর মতে চিত্রকলার স্থান ভাস্কর্যের ওপরে, অথচ তাঁরই করা ফোর্জার অশ্বারোহী মূর্তির মডেল ভাস্করদের অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হিশেবে মিলানে সমাদৃত হত। একজন ভাস্কর হিশেবে এটা মাইকেল-অ্যাঞ্জেলো বরদাস্ত করতে পারেননি। বহু বছরের চিন্তাভাবনার পর লিও-নার্দো ওই মূর্তি তৈরীর পরিকল্পনা ত্যাগ করে মিলান ছেড়ে চলে যান। লিও-নার্দোকে অপদস্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেননি। বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—ব্রোঞ্জে একটা ঘোড়ার ছাঁচ করার জন্য নক্সা তৈরী করেছিলেন; ছাঁচটা তৈরী করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করলে। লজ্জা করে না?

তবে এই রেষারেষির ব্যক্তিগত কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লিওনার্দোর ব্যক্তিত্বে ছিল সেইসব গুণের সমাবেশ যা মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোতে অনুপস্থিত—সৌম্য সুদর্শন চেহারা, অগাধ পাণ্ডিত্য, মনীষা, প্রজ্ঞা, সাধারণ মানুষ ও রসজ্ঞ গণ্যমান্য পণ্ডিতদের মধুর ব্যবহারে সমানভাবে মুগ্ধ করার মত স্বাভাবিক ক্ষমতা। এইসব ব্যক্তিগত যোগ্যতায় লিওনার্দো যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা ছাপিয়ে যেতে পারবেন না জেনেই মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো চাইছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী এই শত্রুকে (এ ছাড়া অন্যকিছু তাঁর সম্বন্ধে ভাবেননি) তার স্বক্ষেত্রেই পরাজিত করার এক সুযোগ। অর্থাৎ চিত্রশিল্পী লিওনার্দোর প্রতিভাকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন তুলি হাতেই।

১৫০৪ সালে সেই সুযোগ জুটে গেল। ফ্লোরেন্সের বিশাল কাউন্সিল হলের একাংশ চিত্রিত করার ভার মে মাসে লিওনার্দোকে দেওয়া হল। বিষয়বস্তু—মিলানের বিরুদ্ধে ফ্লোরেন্সের যুদ্ধজয়। সাত মাস পর হলের উল্টোদিকের দেওয়ালে পিসার বিরুদ্ধে ফ্লোরেন্সের যুদ্ধজয়ের ঘটনা চিত্রায়িত করার জন্য মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোকেও ডাকা হল। অসম্ভব উৎসাহ ও উদ্যমে ছবির প্রাথমিক কার্টুন তৈরীর কাজে তিনি নেমে পড়লেন। ঘুম, খাওয়ার দিকে নজর রইল না। এমনকি যে জামাকাপড় পরে কাজ করতেন তাতেই ঘুমিয়ে নিতেন। তারপর আবার একটানা পরিশ্রম। নিজেকে উজাড় করে দিলেন রঙ তুলির এই সম্মুখ সমরে। এদিকে লিওনার্দোও স্বাভাবিক নৈপুণ্যে গড়ে তুলছিলেন যুদ্ধরত একদল ঘোড়সওয়ারের ছবির এক অনবদ্য কার্টুন (Battle of Anghiari)। মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো প্রথমে ভেবেছিলেন লিওনার্দোর ছবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নিজের সৃষ্টিকে গড়ে তুলবেন। প্রথম-দিকে করা অশ্বারোহী সেনাদের তিনটি স্কেচ্ থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু অনতিকালেই বুঝে গেলেন, লিওনার্দো এক্ষেত্রে অনন্য। প্রতিযোগিতার বিশেষ অবকাশ নেই। তাই ও পথে না গিয়ে মনোনিবেশ করলেন সৈনিকদের নগ্ন অবয়ব চিত্রায়নে, যেখানে তাঁর ক্ষমতা অসামান্য।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনো পক্ষই চূড়ান্ত জয়লাভের সুযোগ পাননি। কাউন্সিল হলের দেওয়াল চিত্রিত করার কাজ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। তবে

কার্টুন মডেল দুটি প্রতিটি চিত্রকরের শিক্ষণীয় বিষয় হিশেবে খ্যাতিলাভ করে। শিল্পকর্ম হিশেবে ছবির ইতিহাসে এবং শিল্পী দুজনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ কাজ দুটি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে শিল্পরসিকরা একমত।

পেশাগত রেষারেষির মধ্যেও শিল্পীর সৃষ্টি কীভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তার এক উদাহরণ সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের রাজসভার চিত্রকর **স্যার জোসুয়া রেনল্ডস**। ওঁর প্রথম জীবনে করা রাজপরিবার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ছবি ছিল তৎকালীন অ্যাকাডেমিক চিত্ররীতি অনুসারী—প্রথাগত, যথাযথ, আবেগবর্জিত, ছিমছাম। অন্যদিকে তাঁর সমসাময়িক **টমাস গেনস্‌বরোর** প্রতিকৃতিতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেল। ক্যানভাস তাই অনেক প্রাণবন্ত, স্বাভাবিক, আলো হাওয়ায় খোলামেলা। ফলে ছবির চাহিদা ও ফরমায়েশ বাড়তে থাকে। দুজনের মধ্যে রেষারেষির সূত্রপাত এখানেই। রেনল্ডস গেনস্‌বরোর এইসব ছবিকে ঠাট্টা করে নাম দিলেন 'fancy pictures', অর্থাৎ শখের ছবি, যা হাল্কা, অগভীর। এই রেষারেষি নিয়ে রয়াল অ্যাকাডেমিতেও তখন বিস্তর সংঘাত। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, রেনল্ডসের ওপরও গেনস্‌বরোর চিত্ররীতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তাঁর করা প্রতিকৃতিও তখন খোলামেলা প্রকৃতির ছোঁয়ায় অপেক্ষাকৃত সজীব। শেষে মৃত্যুশয্যায় গেনস্‌বরো রেনল্ডসকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের ছবি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে রেনল্ডস গেনস্‌বরোর শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, স্বীকার করে নেন ওই সময়কার শিল্পজগতে তাঁর অবদান। রেষারেষির এ এক দুর্লভ মিলনান্তক সমাপ্তি।

শিল্পপ্রতিভা ও মানসিকতায় দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা **ভ্যান গঘ** ও **গগ্যাঁর** মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের নাটকীয় কাহিনী সুপরিচিত, বহুকথনে জীর্ণ। অতএব তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে রেষারেষির মধ্যে সহযোগিতাও কীভাবে পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল সেকথাই এখানে আলোচ্য। তাঁদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই সাহায্য ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে। ভ্যান গঘের ভাই থিওর স্ত্রী স্মৃতিকথায় লিখেছেন, একজন শিল্পীর নিবিড় সাহচর্যে একত্রে কাজ করার ইচ্ছা ভ্যান গঘ লালন করে এসেছিলেন শিল্পীজীবনের গোড়া থেকেই।

আর্লে এসে ঘর সাজিয়ে বসতে এই ভাবনা আরো পেয়ে বসে তাঁকে। ঠিক এই সময় গগ্যাঁর চিঠি আসে। তাতে নিজের নিদারুণ অর্থসংকটের কথা জানিয়ে ছবি বিক্রির জন্য ভ্যান গঘের সাহায্য চেয়েছেন, যদি ভাই থিওকে এ ব্যাপারে একটু বলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল ভ্যান গঘ গগ্যাঁকে বারবার আর্লে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে একত্রে দুজনে কাজ করবেন, থাকবেন। সব খরচা থিওর, গগ্যাঁ ছবি এঁকে তা শোধ করবেন।

এই সহানুভূতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও ছিল। গগ্যাঁ এসে পৌঁছনোর আগেই স্বকীয় ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন ভ্যান গঘ। লিখেছেন—"আমার ছবি দিয়ে গগ্যাঁকে মুগ্ধ করতে চাই। আমার দারুণ ইচ্ছা তাকে নতুন কিছু দেখাব। তাই আমার ছবিগুলো যতটা সম্ভব শেষ করে ফেলছি···।" গগ্যাঁ অবশ্য এই মৌলিকতা স্বীকার করতে চাননি। দাবি করেছেন, তাঁর পৌঁছনোর আগে ভ্যান গঘ ভুল করে যাচ্ছিলেন। শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পরই ভ্যান গঘের কাজে উন্নতি শুরু হয়। তবে ছবি নিয়ে মতভেদ ও সংঘাত সত্ত্বেও দু'জনে একত্রে একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক ছবি এঁকে গেছেন নিজ নিজ রীতিতে। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে, কাফেতে একসঙ্গে কাজ করেছেন, একই মডেলদের চিত্রায়িত করেছেন। গগ্যাঁ অঙ্কনরত ভ্যান গঘের ছবি এঁকে তাঁকে উপহার দিয়েছেন, ভ্যান গঘও প্রতিদান দিয়েছেন Gauguin's Arm Chair -এ। দু'জনেই দু'জনের জন্য আত্মপ্রতিকৃতি এঁকে দিয়েছেন।

বহুকথিত সেই কান কাটার ঘটনার পর দু'জনের ছাড়াছাড়ি হলেও চিঠি-পত্রে ভাববিনিময় অব্যাহত ছিল। আর্লেতে বিখ্যাত মাদাম জিনোর একটি ড্রইং করে দিয়েছিলেন গগ্যাঁ। ভ্যান গঘ তারই ভিত্তিতে একাধিক তৈলচিত্র পরে করেন। এই ছবি গগ্যাঁর ভাল লাগায় আনন্দিত হয়ে তাঁকে লিখলেন—"··· Take this as a work belonging to you and me as a summary of our months of work together···" এছাড়াও আরো একাধিক ছবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন চিঠিপত্রে।

জানিয়েছেন নিজস্ব ধারণার কথা। ভাই থিওকে লিখেছেন, তাঁর মনে হয় দু'জনে আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন। গগ্যাঁর প্রতিকৃতি করার আশাও রাখেন। গগ্যাঁর পরবর্তীকালে করা নানা ছবির নিদর্শন তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়ে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

আসলে হাজার মতপার্থক্য থাকলেও গগ্যাঁর প্রতি তাঁর একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ ছিল। তাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পেরেছিলেন—"I owe a lot to Gauguin". কিন্তু গগ্যাঁর চরিত্রে মিশে ছিল এক উন্নাসিকতা। বন্ধুত্ব নয়, প্রভুত্বের ভাব। এই প্রচণ্ড অহংবোধ ও পেশাদারী ঈর্ষা প্রকাশ পেল ভ্যান গঘের মৃত্যুর পর। ভ্যান গঘের ছবির একক প্রদর্শনীতে আপত্তি জানিয়ে বন্ধুকে লিখলেন—"We should risk damaging our own reputation, without doing Vincent any good".

এই রেষারেষি ও মনান্তরের পাশে **পিসারোর** ভূমিকা এক philosopher, friend ও guide-এর। উনিশ শতকের তিন মহাশিল্পী সেজান, ভ্যান গঘ ও গগ্যাঁর প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছেন বন্ধুর মত। প্রথমে সেজান। প্রাথমিক নানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে প্রতিশ্রুতি দেখে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গ্রামে প্রকৃতির সান্নিধ্যে। একটানা দু'বছর ধরে পারস্পরিক সহযোগিতায় সেজানের ছবিতে আসে মজবুত গড়ন ও উজ্জ্বল রঙ, আর মনে আত্মবিশ্বাস। তারপর থেকে তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে চিত্ররসিকদের ব্যাপক স্বীকৃতি ও খ্যাতি মেলে ১৮৯৫ সালে একক চিত্র-প্রদর্শনীর পর। পিসারোই উদ্যোগী হয়ে এর আয়োজন করান। অখ্যাত তরুণ, 'সানডে আর্টিস্ট' গগ্যাঁকে একইভাবে ওই গ্রামে দীর্ঘসময়ের একটানা সান্নিধ্য নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গগ্যাঁ পরে স্বীকার করেছেন, পিসারো তাঁর অন্যতম এক গুরু। এরপর ভ্যান গঘ প্যারিসে এলে তাঁকে গাঢ় বাদামী ও কালচে রঙের বদলে উজ্জ্বল হাল্কা রঙ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তখন থেকেই ভ্যান গঘের ক্যানভাসে আলোর মুক্তি, রঙের প্রাণচাঞ্চল্য।

তবে ছবির ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে নিবিড় সহযোগিতার ফসল কিউবিস্ট চিত্রকলা, বিংশ শতাব্দীর দুই বিশাল শিল্পব্যক্তিত্ব **পিকাসো** আর

ব্রাকের বন্ধুত্ব ও একত্র সাধনায় গড়া ইমারত। পিকাসোর সঙ্গে ব্রাকের প্রথম পরিচয় পিকাসোর স্টুডিওতে, ১৯০৭ সালে। সেখানে পিকাসোর 'আভিনিওঁর মেয়েরা' দেখে প্রভাবিত হন। ১৯০৮ সাল নাগাদ দু'জনেই উপলব্ধি করলেন, তাঁদের চিত্রসাধনার পথ সমান্তরাল বন্ধুত্বে ছুটে চলেছে একই লক্ষ্যে। সুতরাং দুটি পথ মিশে গিয়ে চিত্রশিল্পে বিস্তৃততর আয়তন যোগ করতে পারে। এই আত্মচেতনার ফলশ্রুতিতে দুই অনন্য প্রতিভা একসঙ্গে কাজ শুরু করলেন ১৯০৮ থেকে। যুগান্তকারী কিউবিস্ট পরীক্ষানিরীক্ষায় একত্রে ব্যাপৃত রইলেন একটানা ছ'বছর, ছবির জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল দু'জনের ঐক্য-বদ্ধ প্রচেষ্টায়। ব্রাকের কথায়, আমরা দু'জন একই দড়ি বেঁধে পাহাড়ে ওঠার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আর ফ্রাঁসোয়া জিলোর কাছে পিকাসোর স্মৃতি-চারণ—"প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতে হয় আমি ব্রাকের স্টুডিওতে যেতাম, না হয় ব্রাক আমার স্টুডিওতে আসতো। সারাদিনের কাজ নিয়ে পরস্পর পরস্পরের চুল-চেরা বিচার করতে বসতাম, যতোক্ষণ না দু'জনের মতামত এক হতো। ক্যানভাসের ছবি সম্পূর্ণ হতো না।"

এঁদের কিউবিস্ট ছবির পর্যালোচনায় এক বিখ্যাত জার্মান সংগ্রাহক উদে একবার মন্তব্য করেছিলেন—ব্রাক হচ্ছেন পরিষ্কার, মাপা আর মধ্যবিত্ত, কিন্তু পিকাসো সম্বৃত, বিশাল, বিদ্রোহী। পিকাসো নিজেও কী সচেতন ছিলেন এ পার্থক্যটুকু সম্বন্ধে? এই ব্রাকের ছবিকে পরে বলেছেন মাদাম পিকাসো, অর্থাৎ পিকাসোর কাজের তুলনায় দুর্বল, নরম! নিবিড় সহযোগিতার মাঝেও রেষারেষি ও আত্মগরিমার কী সূক্ষ্ম সহাবস্থান!

শিল্পী বনাম সমাজ

শিল্পের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, যুগান্তকারী স্রষ্টার চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজের মিল যতটা, গরমিল তার চেয়ে বেশি। চিত্র-শিল্পেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিকবার। প্রচলিত ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত সমাজ শিল্পীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির থই পায় না। তাই তাঁদের দুঃসাহসিক অনন্য সব সৃষ্টিকে মনে হয় সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত। ওই সময়ের রুচির সঙ্গে বেমানান। দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পচেতনার এই পার্থক্য থেকে ঘনিয়ে উঠেছে বিরোধ, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শিল্পীর জীবন।

কিন্তু এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে শিল্পীর এক অপরাজেয় প্রতিজ্ঞা। যা নিজের শিল্পীমানসের কাছে মূল্যবান এক পরম সত্য বলে মনে হয়েছে, এক অনড় প্রত্যয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে একাগ্র সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। সমাজের মাথা বলতে যাদের বোঝায় অর্থাৎ সরকার, প্রশাসন, শিল্পবোদ্ধা ও সমালোচক, আর্টের পৃষ্ঠপোষক ধনীশ্রেণী, আর্ট ব্যবসায়ী, গ্যালারীর কর্মকর্তা, প্রদর্শনীর সংগঠক ও ফরমায়েশী ক্রেতাসাধারণ—তাদের পছন্দ-অপছন্দ বা রুচির কাছে আত্মসমর্পণ না করে, সবরকম ভ্রূকুটি আর সমালোচনা অগ্রাহ্য করে, ঘোষণা করে গেছেন নিজ শিল্পরীতিতে অবিচল আস্থা। সামনের লক্ষ্যে স্থির থেকে সোজা হেঁটে গেছেন নিজের সৃষ্ট রাস্তায়। সমাজের সঙ্গে এই বিরোধের ইতিহাস তাই এক অর্থে শিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরও ইতিহাস।

সর্বকালের সেরা শিল্পীদের অন্যতম **রেমব্রান্টের** সারাটা জীবনই সমকালীন সমাজের সঙ্গে সংঘাতের কাহিনী। সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডে সমাজ বলতে বোঝাত ধনী বণিকশ্রেণী। ইউরোপের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী বন্দর আমস্টার-ডামে ওই সময় ব্যবসাবাণিজ্যের রমরমা অবস্থা। উঠ্‌তি বেনিয়াদের হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা। ফলে জীবন উপভোগ করার নেশায় মশগুল হয়ে উঠল

তারা। দামী নতুন বাড়িতে ঘর সাজাবার জন্য তাদের চাই জাঁকজমকপূর্ণ ঝকমকে সব ছবি যা এই প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধির সঙ্গে মানানসই হবে। অসংখ্য স্টুডিওতে আঁকা হতে লাগল চিত্তাকর্ষক, রঙ-বেরঙের ফ্যাসানদুরস্ত সমাজের ছবি, চকচকে সাটিন, সোনালী ব্রোকেড, কার্পেট, ফুল ইত্যাদি। আর চাহিদা বাড়ল সমাজের মধ্যমণিদের বড় বড় প্রতিকৃতি আর গ্রুপ ছবির। পয়সার সঙ্গে তাদের শিল্পে অমরত্বও চাই বইকি!

কিন্তু এই আত্মম্ভরি উদ্ধত বেনিয়া সমাজের মনোভাবের সঙ্গে রেমব্রান্টের শিল্পদর্শন মিলবে কেন? ফলে অচিরেই ঘনিয়ে এল সংঘাত। ১৬৪২ সালে শহরের ধনী বণিকদের নিয়ে গঠিত এক স্বেচ্ছাসেবী সামরিক সংগঠনের সতের-জন অফিসারের গ্রুপ ছবি এঁকে দেবার ফরমায়েশ পেলেন তিনি। তাদের উদ্দেশ্য—ছবিতে প্রত্যেকের সগৌরব জ্বলজ্বলে উপস্থিতি, যেমনটি তখন প্রচলিত ছিল। The Night Watch শীর্ষক এই বিশ্ববন্দিত ছবিটি শেষ হবার পর যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হল তাতে বোঝা গেল, বেনিয়া সমাজের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্কে এক বিরাট ফাটল ধরেছে। ছবিতে অফিসাররা আধো অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কেউ সামনে কেউ পেছনে, অনেকেই অদৃশ্য-প্রায়। সারা ছবিতেই একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারির খেলা। মনে হল রাতের অন্ধকারে ওরা মার্চ করে চলেছে। ছবির প্রয়োজনে আরো অন্য লোকজন রয়েছে, আছে একটি ফুটফুটে মেয়েও। তখনকার সাবেকি নিশ্চল গ্রুপ ছবি থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা।

ছবি দেখে অফিসারদের অনেকেই ক্রোধে, ক্ষোভে আগাম দেওয়া টাকা ফেরত চাইল। তাদের নেতা ছবিতে নিজেকে চিনতে না পেরে অন্য এক চিত্রশিল্পীকে একাজে নিয়োগ করতে চাইল। কিন্তু রেমব্রান্ট ছবির একচুলও পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না। এ যেন ধনগর্বী ব্যবসায়ীদের প্রতি শিল্পীর এক চ্যালেঞ্জ—টাকা দিয়ে অন্য সব পণ্যের মত শিল্পীসত্তাকে কেনা যায় না। তাদের অন্তঃসারশূন্য জাঁকজমক আর ঐশ্বর্যের বড়াইয়ের সঙ্গে তাঁর কোনোরকম আত্মিক সখ্যতা নেই। বেনিয়ারাও বুঝে গেল, এই মানুষটিকে দিয়ে তাদের কাজ চলবে না। সুতরাং রেমব্রান্ট খারিজ! আর কোনো ফরমায়েশ এরপর

পেলেন না। আয় নেই, চারিদিকে দেনা, সামনে দারিদ্র্যের হাতছানি। শেষ পর্যন্ত দেনা মেটাতে আদালতের আদেশে দেউলে রেমব্রান্টের বাড়িঘর, যাবতীয় সম্পত্তি নীলামে চড়ানো হল। এমনকি তাঁর স্ত্রী একমাত্র সন্তানের প্রতিপালনের জন্য যা টাকাকড়ি ও সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তার এক কপর্দকও পেলেন না। বিপর্যস্ত শিল্পী পুত্রকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন শহরের একটি দরিদ্র আস্তানায়।

রেমব্রান্টের "শাস্তি" আর অপমানের এখানেই শেষ নয়। আমস্টারডামের নবনির্মিত টাউনহলের দেওয়াল চিত্রিত করার আমন্ত্রণ প্রথমে পাননি। কিন্তু নির্ধারিত 'পছন্দসই' শিল্পীদের একজন হঠাৎ মারা যাওয়ায় একখানি দেওয়াল তাঁর ভাগ্যে জুটে গেল। তাঁর কাজ—জুলিয়াস সিভিলিসের চক্রান্ত শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রায়ন। ছবিতে রেমব্রান্ট সঞ্চার করলেন এক নাটকীয়তা যার সঙ্গে তৎকালীন রুচির বিন্দুমাত্র মিল নেই। ফলে আবার পুরনো শত্রুদের চক্ষুশূল হলেন। শহরের কর্তাব্যক্তিদের আদেশে হল থেকে প্যানেলটি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা হল। ওই সময় তাঁর প্রচণ্ড অর্থাভাব। বিপুল দেনা আর অনটনের সঙ্গে লড়াই করছেন। কিন্তু শিল্পীর আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনো আপস তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যাখ্যানের জবাব দিলেন প্রত্যাখ্যানেই। যে ছবি এইভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তার জন্য একপয়সা পারিশ্রমিক নিতে রাজি হলেন না। আর বেনিয়ারা তাঁর পাওনাদারদের দাবি মেটাতে বিশাল ছবিটির একাংশ কেটে বিক্রি করে দিল। তাদের মনোবৃত্তির উপযুক্ত কাজই বটে!

তবে এসব অপমান, বিরোধ আর দুঃখকষ্টের মধ্যেও রেমব্রান্টের আত্মপ্রত্যয় এতটুকু চিড় খায়নি। বরং কঠিন দুঃখের সময়ই তাঁর তুলি জন্ম দিয়েছে কালজয়ী সব চিত্রের। ব্যবসাদাররা ছবি সম্বন্ধে কি ভাবে না ভাবে তা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করেননি। তাই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবিতে কোনো দেবত্ব আরোপ না করে তা সাধারণ এক মৃতদেহ হিশেবে দেখিয়েছেন। মেরীও তাঁর চোখে শাদামাটা পোষাকে এক সাধারণ নারীমাত্র। সমাজের চোখে এসব গর্হিত 'বেআদবি' করার মত সাহস আমৃত্যু তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বে মিশে ছিল। তাদের হীন বস্তুতান্ত্রিক

রুচিবোধ, শিল্পবোধকে পরম অবজ্ঞায় লাথি মেরে মাথা উঁচু করে চলে গিয়েছেন। স্বভাবতই অবহেলায়, অনাদরে, প্রায় নিঃশব্দে মারা যান ; তখন তাঁর সম্পত্তি বলতে কিছু জামাকাপড়, ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম এবং সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পীর স্বাধীন অহংকার।

গগ্যাঁর সঙ্গেও তাঁর সময়কার ফরাসী সমাজের ছিল বরাবরের বিরোধ। প্রচলিত ধ্যানধারণা, নিয়মকানুন সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব স্বাধীন মত অনুযায়ী শিল্পীজীবন যাপনের অধিকার অর্জন করা—এই ছিল তাঁর সাধনা। এইটুকু অর্জনের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে সারা জীবন। তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখে শত্রু হিশেবে চিহ্নিত হয়েছেন, কেননা তাঁর প্রধান শিল্পীপরিচয়, তিনি আদিম মনোভাবাপন্ন, 'প্রিমিটিভ'। এই বন্য স্বতঃস্ফূর্ততায় লাল রঙে ঘোড়া আঁকার অপরাধ (!) সমাজের মাথা ও শিল্পবোদ্ধারা ক্ষমা করতে পারেনি। তাদের চোখে গগ্যাঁর শিল্প 'lunacy', অর্থহীন। এই বিরূপতা, এই বিরুদ্ধতাকে অসীম প্রত্যয়ে অগ্রাহ্য করে ইচ্ছামত চিত্রসৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতা খুঁজে নিলেন তাহিতি গিয়ে। ছবির ফর্ম আর রঙ নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও সিদ্ধিলাভের স্বাক্ষর রয়েছে ওখানকার ক্যানভাসগুলোর প্রতিটিতে। তাহিতির শাসকসমাজেও বহুনিন্দিত হয়ে, দুঃখকষ্টের চরম সীমায় পৌঁছেও, ছবিতে যা করতে চেয়েছিলেন তা-ই করতে পেরেছিলেন। সুসভ্য ফরাসী সমাজের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যাত শিল্পীর এইখানেই চূড়ান্ত জয়। তবে মৃত্যুর পরও এ বিরোধ মেটেনি। প্যারিসে সরকারি সংগ্রহশালার প্রধান সদম্ভে ঘোষণা করেন, গগ্যাঁর ছবি যে কোনো মূল্যে জাতীয় সংগ্রহালয় থেকে দূরে রাখবেনই।

১৮৮৪ সালে ভ্যান গঘ নুনেন অঞ্চলের এক ধর্মযাজকদের পল্লীতে বাবা মার সঙ্গে একত্রে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য, ওখানকার নিসর্গ ও মানুষজন আঁকা। থিওর স্ত্রী এ প্রসঙ্গে স্মৃতিকথায় লিখেছেন—এরকম একটা ছোট্ট গ্রামে একজন চিত্রশিল্পী স্পষ্টতই এক anomaly, বিশেষ করে ভ্যান গঘের মত একজন শিল্পী, যিনি সবরকম প্রচলিত রীতিনীতি, সাবেকি নিয়মকানুন আর ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল পুরোপুরি ছিন্ন করেছিলেন, যিনি অন্যের বশ্যতা কিছুতেই স্বীকার করেননি।

স্বাধীনচেতা, আত্মসচেতন শিল্পীর সঙ্গে এই anomaly শুধু ঐ গ্রামাঞ্চল নয়, বৃহত্তর সমাজেরই। কেবল ওখানে নয়, সর্বত্রই এই বিচ্ছিন্নতায় ভুগেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানসিকতার সঙ্গে নিজের ধ্যানধারণা মেলেনি। কী ব্যক্তিজীবনে, কী শিল্পী হিশেবে, তাঁর মতামত পাত্তা পায়নি। বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সারাজীবনে তাঁর করা বিপুল চিত্রসম্ভারের মধ্যে একটি মাত্র ছবি বিক্রি হয়। বেঁচে থাকতে তাঁর ছবি সংক্রান্ত আলোচনাও মাত্র একবারই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, শিল্পীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সমাজ উপেক্ষা করেছে। অনেক অভিজ্ঞতার সূত্রে তাই উপলব্ধি করেছেন এক নির্মম সত্য—শিল্পীরা আর সমাজের এক অংশ নয়, তার বিরুদ্ধে। সমাজ বারবনিতাকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করে, শিল্পীরাও সেভাবেই প্রত্যাখ্যাত। সমাজের সঙ্গে শিল্পীর বিরোধের স্বরূপ এখানে উদ্‌ঘাটিত। কী অমোঘ, এই উপলব্ধি।

তবে সমাজ যাই ভাবুক, ভ্যান গঘের শিল্পবিশ্বাস তাতে টলেনি। ক্যানভাসে এখনো জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে নিজ চিত্ররীতিতে আস্থা। ভাইকে লেখা এক চিঠিতে এই প্রতিজ্ঞার ঘোষণা সুস্পষ্ট : বেশির ভাগ লোকের চোখে আমি কে? কেউ না, একজন আধপাগলা মানুষমাত্র। এমন একজন যার সমাজে কোনো স্থান নেই এবং কোনোদিন থাকবেও না। এককথায়, নীচের তলার সর্বনিম্ন মানুষ একজন আমি। ঠিক আছে, তা যদি সত্যিও হয়, আমার কাজের মধ্য দিয়ে আমি দেখাতে চাই এই এক ফালতু, আধপাগল মানুষের হৃদয়ে কী আছে। এটাই আমার লক্ষ্য।

ভ্যান গঘের মৃত্যুর পর তাঁর এক গুণমুগ্ধ বলেছিলেন, শিল্পের প্রতি ভালবাসা কথাটা ঠিক সুপ্রযুক্ত নয়, এটাকে বলা উচিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জন্যই ভিনসেণ্ট শহীদ হয়েছিলেন। আলোচিত তিন শিল্পীর এটিই সঠিক মূল্যায়ন।

রাজসভার তিন শিল্পী

ইংরাজীতে যাঁদের কোর্ট পেইণ্টার বলা হয়, সেই রাজসভার চিত্রকরদের নিয়োগ করা হতো প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে। এক, চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ-বশত প্রকৃত গুণী শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা। দুই, গৌরব আর অমরত্ব লাভ, যার মোহ রাজরাজড়াদের চিরকাল। জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় পোষাকে নিজেদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেওয়ার জন্য দেশী বিদেশী খ্যাতনামা শিল্পীদের ওই পদ-মর্যাদা দিয়ে দরবারে রেখে দেওয়া হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজাদের মধ্যে এই ঝোঁক বিশেষ করে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, রাজনীতি অর্থনীতির মত শিল্পক্ষেত্রেও রাজা ও তার রাজসভার ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। রাজানুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা স্বাভাবিকভাবে সে যুগে শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি ও জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়ায়। কোর্ট পেইণ্টাররা তাই এক অর্থে ছিলেন সরকারি চাকুরে, রাজার সম্পত্তি।

এর স্বাভাবিক পরিণতি, শিল্পী-স্বাধীনতার সর্তবদ্ধতা স্বীকার করে নেওয়া। রাজা, তার পরিবারবর্গ ও সভাসদবৃন্দের রুচির হরেকরকম দাবি মেটাতে তাঁদের প্রতিভা ও সময় নিয়োজিত থাকত। ফলে ছবি অনেক সময় চাহিদামাফিক শিল্পবস্তু যোগানের উদাহরণ হয়ে পড়ে। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাজচিত্রকর বুশে তৎকালীন রাজপরিবার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি-মাফিক জাঁকজমকপূর্ণ, আনন্দোচ্ছল ছবির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। বড়-লোকের বিশাল প্রাসাদের ঘর সাজাবার উপযুক্ত উপকরণ হিশেবে সেসব আঁকা। আত্মবিকাশের জন্য জরুরী স্বাধীন পরীক্ষানিরীক্ষার পক্ষে রাজসভার পরিবেশ, বলা বাহুল্য, বিশেষ অনুকূল ছিল না।

তা সত্ত্বেও একাধিক বরেণ্য শিল্পী পারিপার্শ্বিক এইসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার উর্ধ্বে উঠে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

কালজয়ী প্রতিভাকে ওইসব সীমায় বেঁধে রাখা যায় না। তাই ওঁরা যা এঁকে রেখে গেছেন তা আর পাঁচটা সভাশিল্পীদের ছবির মত শুধু দৃষ্টিনন্দন দক্ষ কারিগরিসর্বস্ব নয়, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ। এমন তিনজনকে আমরা এই নিরিখে বেছে নেব।

সর্বকালের অন্যতম সেরা স্পেনীয় শিল্পী **ভেলাসকুজ** সারাটা জীবন স্পেনের রাজসভার চিত্রকর হিশেবে কাজ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬২৩-এর বসন্তে যখন রাজধানী মাদ্রিদে আসেন চিত্রশিল্পী হবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তখন সম্বল বলতে তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। শুধু তিনটি নিজের আঁকা ক্যানভাস, ছবি আঁকার পাকা হাত আর দেখার দুর্লভ চোখ। এই-ই সব। তখন স্পেনের সিংহাসনে বসেছেন হাপসবুর্গ বংশের নতুন রাজা চতুর্থ ফিলিপ। দরবারশিল্পীর পদটি তখনো শূন্য। ভেলাসকুজ ছবি তিনটি নিয়ে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট অলিভারেসের সঙ্গে। মুগ্ধ অলিভারেস অবিলম্বে নিজের একটি প্রতিকৃতির ফরমায়েশ দিলেন তাঁকে। স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হল না আত্মবিশ্বাসী তরুণের। সেই ছবির জোরেই আদায় করে নিলেন অলিভারেসের জোরালো সুপারিশ। স্পেনের রাজসভার শিল্পী হিশেবে তাঁকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হল। তখন তাঁর বয়স সবে চব্বিশ।

এ যেন এলাম, দেখলাম, জয় করলাম ধরনের রূপকথার কাহিনী। এত অল্পবয়সে গ্রামের অজানা অচেনা, অতি সাধারণ এক যুবকের এই অভাবনীয় সাফল্যে মাথা ঘুরে যাবার কথা। তুলির মুখে একরাশ কৃতজ্ঞতাবোধ জমা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু দরবার চিত্রকররূপে রাজার যে প্রথম ছবিটি আঁকলেন তাতেই বোঝা গেল, সাধারণ সভাশিল্পীদের মত রাজার মনোরঞ্জন করে জীবন কাটিয়ে দেবার মত ভবিতব্য তাঁর নয়। যেখানে গৌরবের ছটায় রাজাকে চিত্রিত করার কথা, সেখানে তিনি তুলে ধরলেন রাজার প্রকৃত প্রতিমূর্তি। দেখালেন, অবক্ষয় আর আসন্ন পতনের চিহ্ন ফুটে রয়েছে অবসন্ন চোখ, ভারী ঠোঁট আর ক্রূর মুখমণ্ডলে। তারপর যত দিন গেছে, প্রতিকৃতিতে এই অবক্ষয়ের চিহ্নগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। এমনকি যে কাউন্ট অলিভারে-সের জন্য এই প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি, তাঁকেও ছেড়ে দেননি। পরবর্তীকালে

করা একটি প্রতিকৃতিতে দেখা গেল লোকটার চোখেমুখে ধূর্ততা, ক্রুরতা। আসলে যা ঠিক তাই। আর রাজসভার বিভিন্ন ভাঁড়দের নিয়ে যেসব ছবি আঁকলেন তাতে রাজসভার মিথ্যে আত্মম্ভরিতা ফুটে উঠল। বলতে চাইলেন, সেইসব ক্রীড়নক সভাসদ আর বামনরা (dwarfs) মানবাত্মার চরম অবমাননার প্রতীক। তাঁর আঁকা ঐ বামন, গোইয়ার দানব আর আর পিকাসোর গের্ণিকাকে একই প্রতিবাদী মেজাজের বিভিন্ন চিত্ররূপ হিশেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এটা মনে রাখা দরকার যে ভেলাসকুজের প্রতিকৃতিগুলোতে বাড়াবাড়ি নেই। সেগুলো নিখুঁত, বাস্তবানুগ। যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত ছবি। ডিটেলের কাজ অসামান্য, এতটুকু ত্রুটি বার করার উপায় নেই। সেইসঙ্গে রয়েছে মনমাতানো বর্ণময়তা ও অঙ্কনশৈলীর মুনশীয়ানা, যা দেখে রাজরাজড়ারা বরাবরই ভোলে। তবু এই অবিকল সাদৃশ্য বজায় রেখে তারই মধ্যে যা বলবার তার সবটুকু বলে নিয়েছেন। এ অতি দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয়। যাকে আঁকছেন তার মনের ভাবটুকু টেনে বার করার অন্তর্দৃষ্টি তাঁর শিল্পীপ্রতিভার মূলে ছিল। একবার ইতালি সফরে গিয়ে পোপের (Pope Innocent X) প্রতিকৃতি করলেন। ছবি শেষ হওয়ার পর পোপের ছোট্ট মন্তব্য—Too true to life, বড্ড জীবন্ত হয়েছে। আসলে ছবিতে পোপের ভণ্ডামি, চারিত্রিক ক্রুরতা ও শয়তানির পুরোটা ফুটে উঠেছে ছোট ছোট চোখে, মুখমণ্ডল আর ঠোঁটের চাপা কাঠিন্যে। কতবড় শৈল্পিক সততা আর সাহস থাকলে একজন রাজ-শিল্পীর পক্ষে সে যুগে একাজ করা সম্ভব তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই নির্ভীক স্বাধীনতাবোধ ধর্মীয় কাজেও লক্ষণীয়। তাঁর আঁকা মেরী দেবী নয়, সাধারণ স্পেনীয় নারীর সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। যীশুও তাঁর চোখে লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ এক। ওই সময়কার প্রচলিত বহু ছবির মত ফ্যাকফেকে প্রাণহীন দেবমূর্তি নয়। এ আর এমন কি, এটা মনে হওয়ার আগেই বলে রাখা ভাল যে ঐ সময়টা ছিল স্পেনে ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগ।

চিত্রশিল্পের আর এক দিকপাল গোইয়া ১৭৮৯ সালে স্পেনের রাজা চতুর্থ চার্লসের অভিষেকের পর কোর্ট পেইন্টার পদে নিযুক্ত হন। ভেলাস-

কুজের মত তিনিও রাজরাজড়া বা সভাসদদের গৌরবান্বিত না করে মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন তাদের চরিত্রের অন্তঃস্থলটুকু। গোইয়া ছিলেন সৎ ও সোজা স্বভাবের মানুষ। ওই পদ পেয়েই লিখলেন, তাঁর চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে নিজস্ব নীতিতে অবিচল থাকা এবং প্রত্যেক মানুষের যা উচিত সেই আত্ম-সম্মান বজায় রাখা। প্রায় সারাজীবন সরকারি শিল্পী থাকলেও শিল্পকর্মে তিনি কথা ক'টির মর্যাদা সবসময় রেখেছেন। কর্মসূত্রে রাজসভার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সভাসদ হননি কখনো। চাটুকারিতার মাধ্যমে প্রভুর মন ভোলানোর পথে যাননি, যা অন্যরা করতেন। নিজে যা আঁকা উচিত মনে করতেন তা নিয়ে কোনো রফা করেননি। সম্মান, পুরস্কার, অর্থ রাজসভার লোকজনদের কাছ থেকে গ্রহণ করলেও নিজস্ব শিল্পী-স্বাধীনতাকে তার বিনিময়ে বিলিয়ে দেননি। প্রয়োজনবোধে তাদেরই নির্মম আঘাত করেছেন ছবিতে, স্কেচে। তাই প্রচণ্ড আত্মম্ভরি রাজকর্মচারী ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে পরম ঘৃণাভরে সরাসরি চিত্রিত করেছেন বিনা দ্বিধায়। স্বয়ং রাজাকেও ছেড়ে কথা কননি। ১৭৯৯ সালে প্রধান রাজশিল্পী নিযুক্ত হওয়ার পরের বছর The Family of Charles IV ছবিতে চতুর্থ চার্লসকে দেখালেন এক রাজা নয়, অতি সাধারণ অপদার্থ ব্যক্তি হিশেবে। লাল মুখে আভিজাত্যের লেশমাত্র নেই, বরং তা রীতিমত কুৎসিত। রানীও তাই। ১৮০৮-এ নেপোলিয়নের মাদ্রিদ দখলের পর সপ্তম ফার্দিনান্দ সিংহাসনচ্যুত হয়ে ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। তিনিও সমান অযোগ্য, ব্যক্তিত্বহীন। স্বভাবসিদ্ধ খোলাখুলি মেজাজে ঘোড়ায় চড়া এক প্রতিকৃতিতে গোইয়া তাঁকেও সেইভাবে আঁকলেন। নিজ মনোভাবের স্বাধীন প্রকাশে এইভাবেই তিনি একরোখা।

তবে বছরের পর বছর একটানা রাজা আর সভাসদদের প্রতিকৃতি করার সরকারি গুরুদায়িত্ব পালন করে গেলেও ব্যক্তিগত শিল্পসৃষ্টির সময় করে নিতে পেরেছিলেন। সেসব কাজে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা ও আত্মপ্রকাশের তাগিদ ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পরিণত ক্যানভাসে বেজে উঠেছে অভি-যোগ আর বিতর্কের সুর। Caprices শীর্ষক ছাপাই কাজের এক সিরিজে দ্ব্যর্থহীন চিত্রভাষায় জানিয়ে দিলেন, তাঁর সহানুভূতি নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের

প্রতি যাদের শাসকরা ঘৃণা করত। সব মিলিয়ে আপসহীন স্বাধীনচেতা এক শিল্পী হিশেবে গোইয়ার টানটান ছবিটি স্পষ্ট। তৎকালীন স্পেনীয় শাসক ও রাজসভার ধ্যানধারণা ও নীতির বিপরীতধর্মী এইসব ছবি ও আচরণ রীতিমত দুঃসাহসিক, বিশেষত তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিয়াল্লিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দশ বছরই (১৬৩১-৪১) ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্লসের দরবারশিল্পী পদে কাজ করেছিলেন **ভ্যান ডাইক**। একশ বছর আগে অষ্টম হেনরীও জার্মান চিত্রকর হলবিনকে রাজসভায় এই-ভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, নিজের মহিমান্বিত প্রতিকৃতি করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দু'জনের ছবির মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান! হলবিনের আঁকা অষ্টম হেনরী সর্বশক্তিমান এক সম্রাট। আর ভ্যান ডাইকের প্রতিকৃতি-গুলোতে চার্লসের চোখেমুখের অভিব্যক্তিতে রয়েছে একধরনের অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তার সূক্ষ্ম ছায়াপাত। দুর্লভ সততা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারি এই শিল্পীর বিশ্বস্ত তুলিতে ধরা পড়ে গেছে সম্রাটের মনোজগতের গোপনতম সত্যটি—দীর্ঘকালের অপ্রতিহত রাজক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করেছে ভেতর ভেতর। রাজাশ্রিত হলেও মিথ্যার জাল বুনে তাঁর মনোরঞ্জন করতে চাননি। ১৬৪১ সালে ভ্যান ডাইকের মৃত্যুর ন'মাস পর ইংলণ্ডে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক লড়াই শুরু হয় ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে। অনতিকালেই চার্লসের উদ্ধত শির লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়। অদূর ভবিষ্যতের এই পরিণামের ইঙ্গিত যেন বহন করে চার্লসের ওইসব প্রতিকৃতি।

চিত্রকরের দুঃসাহস, নির্ভীকতা ইত্যাদি দেখাবার উপযুক্ত জায়গা মধ্যযুগের রাজসভা নিশ্চয় নয়। তবু যা বলার অকপটে এই তিনজন তা প্রকাশ করতে পেরেছেন অসামান্য শৈল্পিক সার্থকতায়। ওঁরা দরবার চিত্রকর নন, শিল্পী।

রাজনৈতিক ছবি

রাজনৈতিক সিনেমা ও সাহিত্য নিয়ে যতটা আলোচনা হয়ে থাকে, রাজনৈতিক চিত্রকলা বিষয়ে তার কিছুই হয়নি। অথচ এই ছবির দীর্ঘদিনের একটা ইতিহাস আছে। রাজনীতি ব্যক্তি বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। তাই একাধিক দিকপাল শিল্পী ছবির মূল্যবান উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে, আর অনুপ্রেরণা সেই পরিস্থিতিতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায়—ক্রোধ, ঘৃণা বা তীব্র বিষাদে। রাজনীতির সঙ্গে শিল্পকলার যোগ আছে কী নেই, থাকা উচিত কী উচিত নয়, এসব অতি পুরনো তাত্ত্বিক বিতর্ক তখন অর্থহীন। রাজনৈতিক ছবি শিল্পীর এই reaction-এর ছবি। তাঁর সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে জানবার দলিল।

একটু অন্যভাবে দেখলে তা অবশ্য শিল্পীর রাজনৈতিক আবেগেরও চিত্ররূপ। এই আবেগটুকু না থাকলে ছবি হিশেবে, শিল্পকর্ম হিশেবে তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। এর প্রমাণ ফরাসী চিত্রকর দাভিদ, "a man of political passions". ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব তাঁর সমগ্র শিল্পীচেতনা দখল করে নিয়েছিল। আর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিজের ভূমিকাও ছিল খুব সক্রিয়। স্বভাবতই তাঁর ক্যানভাসে এই যুগান্তকারী ঘটনার এক আলাদা মর্যাদা। বৈপ্লবিক আবেগে দাভিদ একের পর এক চিত্রায়িত করে গেছেন টালমাটাল সেই দিনগুলোর নানা ঘটনা আর স্মরণীয় বীর শহীদদের। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবের সামনের সারির নেতা মারা (Marat)। ১৭৯৩ সালে সাহায্য প্রার্থনার ছলে রাজতন্ত্রের সমর্থক এক স্ত্রীলোক অফিসে ঢুকে তাঁকে হত্যা করে। প্রিয় বন্ধুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে বিচলিত দাভিদ তুলি ধরলেন, সৃষ্টি হল ফরাসী চিত্রকলার এক মাস্টারপিস Marat Assassinated. ছবিতে দুঃখ ছাপিয়ে উঠল এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বিপ্লবের আদর্শের প্রতি শিল্পীর আস্থা

ঘোষণা। এ এক শহীদের মৃত্যুবরণের ছবি, এ মৃত্যু স্বাধীনতার জন্য। তেমনি গিলোটিনে নিয়ে যাবার পথে মারি আঁতয়নেতের এক স্কেচে দাভিদ দেখালেন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর মনোভাব কতটা আপসহীন, কতটা নির্মম।

আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকবছর পর নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখলের পর দাভিদ তাঁর সঙ্গেও একই আত্মিক সখ্যতা অনুভব করলেন। একই আবেগ তিনি খুঁজে পেলেন নেপোলিয়নের রাজত্বকালে। ফলে বিপ্লবের ছবিকে যে attachment নিয়ে এঁকেছিলেন, নেপোলিয়ন ও তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনা সেইভাবে চিত্রিত করে গেলেন ক্যানভাসের বিস্ময়কর বিশালতায়, আর অসাধারণ পরিশ্রম, একাগ্রতা ও নিষ্ঠায়। মারা-র মত নেপোলিয়নও ওই সময় দাভিদের তুলিতে সমান মহিমান্বিত। ১৮১২ সালে দাভিদের Napoleon in his Study দেখে সম্রাট স্বয়ং বলেছিলেন—"You have understood me David By night I work for the welfare of my subjects and by day for their glory." দাভিদের ছবি মূলত এই understanding-এর ছবি এবং এবং সেজন্যই তা রাজনৈতিক। এই understanding থেকেই জন্ম নেয় শিল্পীর যাবতীয় আবেগ ও দায়বদ্ধতা, যা রাজনৈতিক শিল্পকর্মের পূর্বশর্ত, জরুরী উপাদান।

দাভিদের সমসাময়িক, দিকপাল স্পেনীয় শিল্পী **গোইয়া** এই ছবির আলোচনায় অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকেন। থাকবেনও। স্পেনের রাজসভার চিত্রকর হিশেবে রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর থাকার কথা নয়, বিশেষ করে ওই সময়কার বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে। তবু সরকারি কাজকর্মের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে করা নানা ধরনের কাজে তিনি তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব ও পরবর্তীকালে স্পেন ও ইউরোপের রাজনৈতিক তোলপাড়ের নিজস্ব মূল্যায়ন দিয়ে তার শুরু। বিশেষ করে ১৮০৫-এর পর থেকে স্পেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর গভীর উদ্বেগ, ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পায় গ্রাফিকের কাজ ও অজস্র স্কেচে।

তবে গোইয়ার রাজনৈতিক চিত্রকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা ১৮০৮ সালে। সেবছর মে মাসে ফরাসী সেনা স্পেন দখল করায় দীর্ঘস্থায়ী

প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দখলদার সেনা তাঁর জন্মস্থান সারাগোসা তছনছ করার পর শিল্পী সেখানে যান। মনের বেদনায় বেশ কিছু দুঃসাহসিক স্কেচ্ করলেন। কিন্তু ফরাসী বাহিনী সেসবের সন্ধান পেয়ে ধ্বংস করে ফেলে। ১৮০৮ থেকে ১৮০৯-এর মধ্যে রচনা করলেন স্মরণীয় একগুচ্ছ এচিং—The Disasters of War. ওই যুদ্ধের ভয়াবহতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তা যেমন অনবদ্য, দেশের মানুষের অপরিসীম দুঃখদুর্দশায় শিল্পীর বেদনা প্রকাশেও সমান-ভাবে সার্থক। এখানে এই নৃশংসতার প্রতি গোইয়ার প্রতিক্রিয়া আপসহীন বিরোধিতার। যে হিংস্র ভঙ্গীতে, যে চিত্রভাষায় তা প্রকাশ করেছেন, ইউরোপীয় চিত্রকলায় তার নিদর্শন বিরল।

দখলদারদের বিরুদ্ধে স্পেনের মানুষের প্রতিরোধ ক্যানভাসে চিত্রবদ্ধ করার ইচ্ছা তখন থেকেই মনে সযত্নে লালন করে এসেছিলেন। ১৮১৪ সালে সে সুযোগ হয়ে গেল। নিজে উদ্যোগী হয়ে চেয়ে নিলেন ওই কাজের ফরমায়েশ। এতদিন তুলি ও মননে কীভাবে শান দিয়ে রেখেছিলেন তার পরিচয় তুলে ধরলেন দু'টি ছবিতে—2 May 1808 এবং 3 May 1808. দোস্‌রা মে মাদ্রিদের মানুষ ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, আক্রান্ত হয় সেনাবাহিনী। প্রথম ছবিটিতে সেই বিদ্রোহের বর্ণময় বর্ণনা। দখলদাররা প্রতিশোধ নেয় পরের দিন, যা প্রায় গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় ছবি সেই হত্যালীলার নাটকীয় চিত্রায়ন। ফায়ারিং স্কোয়াডে একদল স্পেনীয় নাগরিক, মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা। রাতের অন্ধকার পশ্চাৎপটে তা আরো ভয়াবহ। বস্তুত, যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মানুষের প্রতি নৃশংসতার বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার, সফল প্রতিবাদ পিকাসোর গের্ণিকা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। প্রকাশভঙ্গীর সার্থকতায় ও impact সৃষ্টিতে ছবি দুটি, বিশেষত দ্বিতীয় ছবিটি আধুনিক চিত্রকলায় অনন্য।

শিল্পীর রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে অব্যর্থ প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা যখন এইভাবে মিলে যায় তখনই সার্থক রাজনৈতিক ছবির জন্ম হয়। জেরিকোর Raft of the Medusa (১৮১৯) এমনই এক শিল্পকর্ম, যদিও সরাসরি কোনো রাজনৈতিক ঘটনা এখানে আঁকা হয়নি। তৎকালীন ফরাসী নৌবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় সমুদ্রে ঝড়ে বিধ্বস্ত এক নৌযানের যাত্রীরা প্রাণ হারায়।

ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে সংস্কারের দাবি। জেরিকো এই প্রতিবাদের সংগঠনে সক্রিয় হয়ে প্রচারপুস্তিকা ছাপায় সাহায্য করলেন। তারপর বেশ কিছু সময় নিয়ে বিভিন্ন স্কেচ্ ও স্টাডির পর গড়ে তুললেন উত্তাল সমুদ্রে ডুবন্ত বিপন্ন যাত্রীদের অসহায়তার জীবন্ত মাস্টারপিস। ফ্রান্সের আপামর মানুষের সঙ্গে শিল্পীর আবেগঘন প্রতিবাদও একত্রে মূর্ত হয়ে রইল চিরকালের মত। এইখানেই ছবিটির রাজনৈতিক তাৎপর্য। বলা বাহুল্য, ওই সময় তা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

Raft of the Medusa দেলাক্রোয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জেরিকোকে প্রায় গুরুর মত মান্য করতেন। সমকালীন ঘটনার বর্ণময় উপস্থিতি (এবং ব্যাখ্যা) তাঁর ক্যানভাসেও। প্রথমে গ্রীক স্বাধীনতার যুদ্ধ, তারপর ১৮৩০ সালে প্যারিসে জুলাই বিপ্লব। শেষোক্ত ঘটনা তাঁর উদার স্বাধীন শিল্পীমনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প্যারিসের রাস্তায় জনসাধারণের লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেইসব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হল অবিস্মরণীয় Liberty at the Barricades. রাস্তায় স্তূপাকার মৃতদেহের ওপর সংগ্রামরত মানুষের পাশে দেখা গেল পতাকা হাতে এক দৃপ্ত নারীমূর্তি, যা স্বাধীনতার প্রতীক। বিপ্লবের মেজাজটুকু সঠিক ধরেছেন এই ছবিতে। এখানেও শিল্পীর সেই আবেগ, সেই উপলব্ধি, সেই একাত্মবোধ এবং রাজনৈতিক তাগিদ কাজ করেছে। নইলে কেন বলবেন—আমি আমার দেশের জন্য যুদ্ধ করিনি বটে, তবে তার জন্য একটা ছবি এঁকে রেখেছি।

গোইয়া এঁকেছিলেন দখলদার ফরাসীদের বিরুদ্ধে স্পেনের মানুষের স্বাধীনতার লড়াই। আর পিকাসো ফ্যাসিবাদী ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাদের একই সংগ্রামকে শুধু শিল্পকর্মে জায়গা করে দেননি, নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে একাজে নিয়োজিত করেছিলেন। স্পেনে এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রাঙ্কোকে সরাসরি আক্রমণ করলেন "ফ্রাঙ্কোর স্বপ্ন ও মায়া" শীর্ষক একগুচ্ছ এনগ্রেভিং-এ। সেটা ১৯৩৭-এর জানুয়ারী। এই একনায়কের যাবতীয় ভণ্ডামির স্বরূপ এখানে প্রকাশিত। মে মাসে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন—"স্পেনের যুদ্ধ জনতার ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধ।

শিল্পী হিশেবে আমার সারাটি জীবন শিল্পের মৃত্যু ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়।······ যে ম্যুরালটিতে আমি এখন কাজ করছি, তার নাম আমি দেব গের্ণিকা। যে সামরিক গোষ্ঠী স্পেনকে বেদনা আর মৃত্যুর সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সেই ছবিতে ও অন্যান্য সাম্প্রতিক শিল্পকর্মে আমার ঘৃণা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়েছি।" গের্ণিকা তাই এক অমর স্মারক। ফ্যাসিবাদীদের হত্যালীলা ও ধ্বংসের শুধু নয়, পিকাসোর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতারও। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চিত্রমালার কেন্দ্র-বিন্দুতে তার স্থান। গের্ণিকা শেষ করার প্রাথমিক পর্বে যে অজস্র ড্রইং ও তৈলচিত্র করেন, তাতেও মূর্ত পিকাসোর এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ, বিক্ষোভ।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। নাৎসী কবলিত প্যারিসে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে রচনা করে গেলেন Seated Woman সিরিজের বিপুল চিত্রসম্ভার। সেসব নারীমূর্তি বিকৃত, ভাঙ্গাচোরা। পিকাসো বোঝাতে চাইলেন, ফ্যাসিবাদীদের হাতে ইউরোপজোড়া মানুষ এইভাবেই বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। ওই ক'বছরে পিকাসোর ক্রোধ আর ঘৃণার প্রকাশ এখানে ঘটেছে। "I did not paint the War···but in the pictures I painted at that time the War is present." —পরে লিখেছেন এ সম্পর্কে। তবে শুধু ছবি এঁকে নয়, সক্রিয়ভাবেও নাৎসী প্রতিরোধে হাত মেলান অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতা থেকেই বোঝা যায় কেন ১৯৪৫ সালে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন—"শিল্পী একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ, দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে তাই নিয়ে সতর্ক, যন্ত্রণাকাতর, আবেগময়, আনন্দিত। ···না, ঘরদোর সাজানোর জন্য ছবি আঁকা হয় না। ছবি হলো শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের আর শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র।"

শিল্পীর এই রাজনৈতিক যন্ত্রণাকাতরতা, এই আবেগময়তা আবার দেখা গেল ১৯৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়। নিরীহ মানুষের অবাধ হত্যালীলার বেদনায় সৃষ্টি হল The Massacre in Korea. দেখালেন একদল নিরস্ত্র নগ্ন স্ত্রীপুরুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করছে সশস্ত্র সৈনিকরা। এই massacre-এর দিন এখনো শেষ হয়ে যায়নি একথা তাঁর চেয়ে ভাল

আর কোন শিল্পী ওই সময় জানতেন ? তাই জানালেন—"ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করতে আমার ছবিও কিছু করে থাকতে পারে—এই আমার সবচেয়ে বড় আশা।"

পিকাসো যখন এই গের্ণিকা সিরিজ আঁকেন বা যুদ্ধের চেহারা ফুটিয়ে তোলেন ক্যানভাসে, ইউরোপের চিত্রকলায় তখন বিমূর্তবাদের প্রাধান্য, ছবির আলংকারিক দিক নিয়ে নাড়াচাড়াই বেশি। সমকালীন রাজনীতি নিয়ে ছবি করার তাগিদ কারো মনে আসেনি। এদিক দিয়ে পিকাসো একা, অনন্য। আমাদের দেশে **গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও** তাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর তুলিই সচল হয়ে উঠেছিল সর্বপ্রথম। অন্য শিল্পীরা যখন কাব্য পুরাণ আর ইতিহাসের কল্পনাধূসর জগতে বিচরণে ব্যস্ত, গগনেন্দ্রনাথ তখন আঁকলেন এদেশের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিবাদের ছবি "পাঞ্জাবে শান্তি পুনঃস্থাপিত।" এই শান্তি আসলে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। তাই দেখান হল মৃতদেহে আবৃত বিশাল প্রান্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উড়ছে। ওই সময়কার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এক অসম সাহসের ব্যাপার। সার্থক রাজনৈতিক ছবি তাঁদের হাতেই সৃষ্টি হয় যাঁদের আছে বিচলিত হবার মত এই প্রগাঢ় সংবেদনশীলতা, আর জ্বলে ওঠবার মত সাহস।

শুধু ছবি নয়, লড়াইও

আগের দুটি লেখায় আমরা দেখেছি সংঘাতের ব্যক্তিগত রূপ—শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর, শিল্পীর সঙ্গে সমাজের। এবার দেখব সংঘাতের গোষ্ঠীগত দিক—শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজের।

১৮৭৪ সালের ১৫ই এপ্রিল প্যারিসে নবীন শিল্পীদের এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। তাতে **ক্লোদ মোনের** একটি ছবি ছিল। বিষয়, লে হাভ্‌রে বন্দরে কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্যোদয়, নাম, Impression : Sunrise. দেখে এক সমালোচক বিদ্রূপ করে লিখলেন, ওটা ইম্‌প্রেশনওয়ালাদের প্রদর্শনী। ওরা ইম্‌প্রেশনিস্ট। ভদ্রলোক জানতেন না, রেনেসাঁসের পর ইউরোপীয় চিত্রকলায় সবচেয়ে বড় এক বিপ্লবের নামকরণ তিনি করে গেলেন। এই ইম্‌প্রেশনিস্‌ম বা প্রতিচ্ছায়াবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ওঁরা ছ'জন—মোনে, রেনোয়া, পিসারো, সিসলে, দেগা ও মরিসো। স্টুডিওর মাপা চৌহদ্দিতে নয়, একটানা লড়াই-এর মধ্য দিয়ে এর জন্ম। যা আজো নতুন করে বলবার।

বিদ্রোহ ছাড়া শিল্পের কোনো নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়নি—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য প্রতিচ্ছায়াবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। ইতিহাস, বস্তাপচা ভাবালুতা, প্রচলিত মামুলি বিষয়বস্তুকে বর্জন করে ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, সমকালীন জীবনের নানা দিক ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য ক্যানভাসে ধরে রাখবেন। এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার হল রঙ। এই রঙের ব্যবহারেই তাঁরা বিপ্লব আনলেন। বহু ব্যবহারে জীর্ণ, সাবেকি গাঢ় বাদামী ও ধূসরের বদলে ছোট ছোট তুলির আঁচড়ে খাঁটি অবিমিশ্র রঙ ব্যবহার করলেন। ফলে ক্যানভাস হয়ে উঠল হালকা জ্বলজ্বলে রঙে উজ্জ্বল, রং মাতাল। আলোর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা একত্রে ফুটে উঠল একটি ক্যানভাসের পরিসরে। বিনোদবিহারীর ভাষায়, ছায়ার জটিল জাল থেকে আলো মুক্তি

পেল। তবে স্টুডিওর ছায়াচ্ছন্নতায় নয়, খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতির কাছে ফিরে চল, এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা বিষয়-বস্তুর সামনে বসে তার তাৎক্ষণিক, বাস্তবসম্মত রূপ নিজস্ব অনুভূতিতে ফুটিয়ে তুললেন।

ওই সময়কার ফরাসী শিল্পরসিকদের কাছে কিন্তু এ জাতীয় ছবি আকর্ষণীয় ছিল না। বিরূপ ছিলেন সাধারণ মানুষ ও ছবির ক্রেতারাও। এই পরি-প্রেক্ষিতে প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীদের সিদ্ধান্ত অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচায়ক। একটা আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আনন্দে মেতে রইলেন। আঁকা হতে লাগল মনমাতানো সব ছবি। এমিল জোলা মুগ্ধ হয়ে বললেন—এদের ছবি জীবন্ত, কেননা তা জীবন থেকে নেওয়া। জোলা ছাড়াও বন্ধুস্থানীয় অনেকেই ছবির তারিফ করলেন। উৎসাহিত হলেন ওঁরা। ছবির প্রদর্শনী করার ইচ্ছা তখনই মনে দানা বাঁধে।

কিন্তু কোথায় দেখান হবে ছবি? প্রথাগত নিয়ম-কানুনের বাধা না মেনে যে স্বাধীন ভঙ্গীতে প্রকৃতি ও জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন, তা রক্ষণশীল শিল্পবোদ্ধাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। অথচ প্যারিসে তখনকার আর্টের জগতের মোড়ল এরাই। এদের উদ্যোগে প্রতিবছর যে সালোঁ বা চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হত তাতে প্রতিচ্ছায়াবাদীদের যে জায়গা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এই অ্যাকাডেমিকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক হল নিজেরাই ছবির প্রদর্শনী করবেন। ছ'জনকে নিয়ে গঠিত হল এক কোম্পানি। কেউ সালোঁতে ছবি পাঠাবেন না এমন বাধানিষেধও ১৮৭৭ সাল থেকে আরোপ করা হয়। আরম্ভ হল আর্ট এস্ট্যাবলিশমেন্ট-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই। আত্মসচেতন একদল শিল্পীর সঙ্গে এই প্রথম একটা শিল্প-আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ল।

ফটোগ্রাফার নাদারের স্টুডিওতে ১৮৭৪ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে, এই এক মাস মোট তিরিশজনের ছবি নিয়ে প্রথম প্রদর্শনী হল। অধিকাংশ সমালোচকই উপহাস করে লিখলেন, নয়তো চুপচাপ দেখে চলে গেলেন। দর্শক সমাগম হল সামান্যই, আর ছবি বিক্রির কথা না বলাই ভাল। কোম্পানি

লাটে উঠলো, শেষ পর্যন্ত দেনার দায় মেটাতে ছবি নীলামের ব্যবস্থা করতে হল জলের দরে। যাঁদের আয় নেই, বিশেষ করে মোনে ও পিসারোর দারিদ্র্য চরমে উঠল। সময় সময় রঙ ও ক্যানভাস কেনার পয়সা পর্যন্ত মিলত না। এমন দিনও গেছে যখন মোনে সাহায্য চেয়ে একের পর এক চিঠি লিখেছেন এমিল জোলা, এডুয়ার্ড মানে এবং অন্যান্য বন্ধুদের।

এত প্রতিকূল অবস্থায় কিন্তু তাঁরা ভেঙ্গে পড়েননি। অসীম মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে কাজ চালিয়ে গেলেন। শুধু চালিয়ে গেলেন নয়, অবিস্মরণীয় সব শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে চললেন। বেশ কিছু মাস্টারপিস রচিত হয় এই অন্ধকার দিনগুলোতে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রদর্শনী অব্যাহত রইল। ১৮৭৬ সালে দ্বিতীয়বার এর আয়োজন করা হয়, অংশ নিয়েছিলেন আঠারোজন। এবার জুটল সাধারণ দর্শকের উপহাস আর সমালোচকদের জোটবদ্ধ নির্মম আক্রমণ। একজন এইসব ছবিকে রঙের বাক্স হাতে বাঁদরের কাজের সঙ্গে তুলনা করে বললেন—এরা হল পাঁচ ছ'জন উন্মাদ, self-styled চিত্রকর, খেয়ালখুশি মত ক্যানভাসে রঙ ছুঁড়ে মারে। আরেক বোদ্ধা (!) লিখলেন—ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর কাকে বলে? আমাদের মতে সে এমন একজন যে কিছু না জেনেই ছবি আঁকতে চায়, যার প্রতিভা বা ট্রেনিং নেই যাতে ভাল কিছু করতে পারে। তবু সে এমন সব ছবি আঁকে যার দাম ফ্রেমগুলোর চেয়ে বেশি নয়।

এইসব তীব্র বিষোদ্গার থেকেই বোঝা যায়, সাবেকি ধ্যানধারণার মূলে ছবির টেকনিক ও বিষয়বস্তু কীরকম কুঠারাঘাত করেছিল। পরিবর্তনটা যে বৈপ্লবিক তা বুঝতে পেরেই এস্ট্যাবলিশমেন্ট-এর ধারক ও বাহকরা প্রতিচ্ছায়াবাদীদের একেবারে নস্যাৎ করার কাজে উঠেপড়ে লেগে গেল। আজকের মত তখনও ছবি কেনা বেচা লাভ লোকসানের কাঠিতে মাপা ব্যবসা ছিল। কাজেই ওসব রদ্দিমার্কা ছবি কেনা লোকসান এই ধারণা একবার ছড়িয়ে দিতে পারলেই হল।

এই ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার আসল কারণ কিন্তু আরো গভীর এবং তা তৎকালীন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিহিত। এই পরিপ্রেক্ষিতটুকু মনে না রাখলে প্রতিচ্ছায়াবাদীদের লড়াইয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

উপলব্ধি করা যাবে না।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশক ছিল একটা রাজনৈতিক তোলপাড়ের সময়। বিশেষ করে প্রথম ভাগ। ১৮৭০-এ ফ্রান্স-প্রুশিয়ার যুদ্ধ, ফ্রান্সের পরাজয়, প্যারিস কমিউনের উত্থান ও পতন এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার পত্তন—এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পরপর ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭১-এ প্যারিস কমিউনের পতনের পর বিপ্লবীদের ওপর নেমে আসে চরম প্রতিশোধের খড়্গ। হাজার হাজার বিপ্লবীকে হত্যা করা হয়। এর ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে ভীতি ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব শিল্পজগতেও পড়ে। শুধু রাজনীতি নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের যে কোনো সম্ভাবনা-কেই সমূলে বিনাশ করতে শাসকরা বদ্ধপরিকর ছিল। শিল্পকলাও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। চিত্রশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন যাঁরা তাদের চোখে তাঁরাও বিপ্লবী। বিশেষ করে যখন এস্ট্যাবলিশমেণ্টকে অগ্রাহ্য করে তাদের নাকের ডগায় নিজস্ব প্রদর্শনী করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। একটি প্রগতিশীল পত্রিকায় প্রতিচ্ছায়াবাদী ছবির প্রশংসা পড়ে Universal Monitor স্পষ্ট করেই লিখল—রাজনৈতিক বিপ্লবীদের সঙ্গে শিল্পজগতের বিপ্লবীরা হাত মিলিয়েছে। এ তো আশা করা গিয়েছিল।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী হিশেবে চিহ্নিত হওয়ার অর্থই খতম হবার সম্ভাবনা। কাজেই এই মহান দায়িত্ব পালনে সমালোচকের দল আত্মনিয়োগ করলেন। আর প্রতিচ্ছায়াবাদীরা এর জবাব দিলেন ঠিক পরের বছরই (১৮৭৭ সালে) তৃতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শুধু তাই নয়, তাঁরা যে মূলত এস্ট্যাবলিশমেণ্ট বিরোধী তা বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হল 'ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনী।'

এইরকম এক প্রতিকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় টিঁকে থাকা ও এস্ট্যাবলিশমেণ্ট বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া যে কতখানি সাহস ও মনোবলের পরিচায়ক আজ তা হয়ত আমরা পুরোটা উপলব্ধি করতে পারব না। স্রেফ টিঁকে থাকার জন্য যে সহায় সম্বল দরকার তা অনেকেরই ছিল না। অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায় ছবি বিক্রি। তীব্র অপপ্রচারের ফলে সেদিক থেকেও

সাফল্য প্রথমে আসেনি। তবু ১৮৭৯-তে চতুর্থ, ১৮৮০-তে পঞ্চম, ১৮৮১-তে ষষ্ঠ ও ১৮৮২ সালে সপ্তম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতি বছরই প্রদর্শনী হয়েছে, কোনো ছেদ পড়েনি। বোঝা যায়, কিরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পিসারো ও দেগারা একের পর এক ছবি দেখিয়ে গিয়েছিলেন, অ্যাকাডেমি ও বিরূপ সমালোচকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। সাফল্য আনতে শরণাপন্ন হননি সেইসব আর্ট ব্যবসায়ীর যারা সাবেকি শিল্প ও সরকারি ব্যবস্থার সমর্থক।

তবে মনে রাখা দরকার, প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীদের মধ্যে মতভেদ ও মতানৈক্যও ছিল। সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী বলতে যা বোঝায় তা তাঁরা ছিলেন না। ১৮৮০-র পর থেকে মোনে ও রেনোয়া এই গোষ্ঠী থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, সিসলেও একবারের বেশি ছবি পাঠাননি। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। হাল ধরেছেন পিসারো ও দেগা। এস্ট্যাবলিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন দুজনেই। বোঝাপড়ার পথে যাননি, সালোঁতেও ছবি পাঠাননি। বরং নতুন শিল্পীদের ডেকে এনেছেন প্রদর্শনীতে। গগ্যাঁ, সেজান ও স্যুরার মত শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। ১৮৮৬-তে অষ্টম প্রদর্শনীতেও ১৭ জনের ছবি ছিল। সেই শেষবার। ততদিনে অবশ্য সমালোচনার ধার কমে এসেছে, ছবির আবেদন ক্রমশ চিত্ররসিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের বাইরে বৃটেন, জার্মানি, হল্যাণ্ড ও বিশেষভাবে আমেরিকায় প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্রশৈলী তখন বেশ জনপ্রিয়। এতদিনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর মনোবলের সে-ই যথার্থ পুরস্কার।

তবে শিল্প দ্রুত বিবর্তনশীল। এরপর চিত্রকলাকে বিস্তৃততর, পরিণত আধুনিক যুগে এগিয়ে নিয়ে গেলেন উত্তরকালের শিল্পীরা। প্রতিচ্ছায়াবাদই চিত্রশিল্পে আধুনিকতার জনক।